গণমাধ্যম ও নারী

অনুপম হায়াৎ

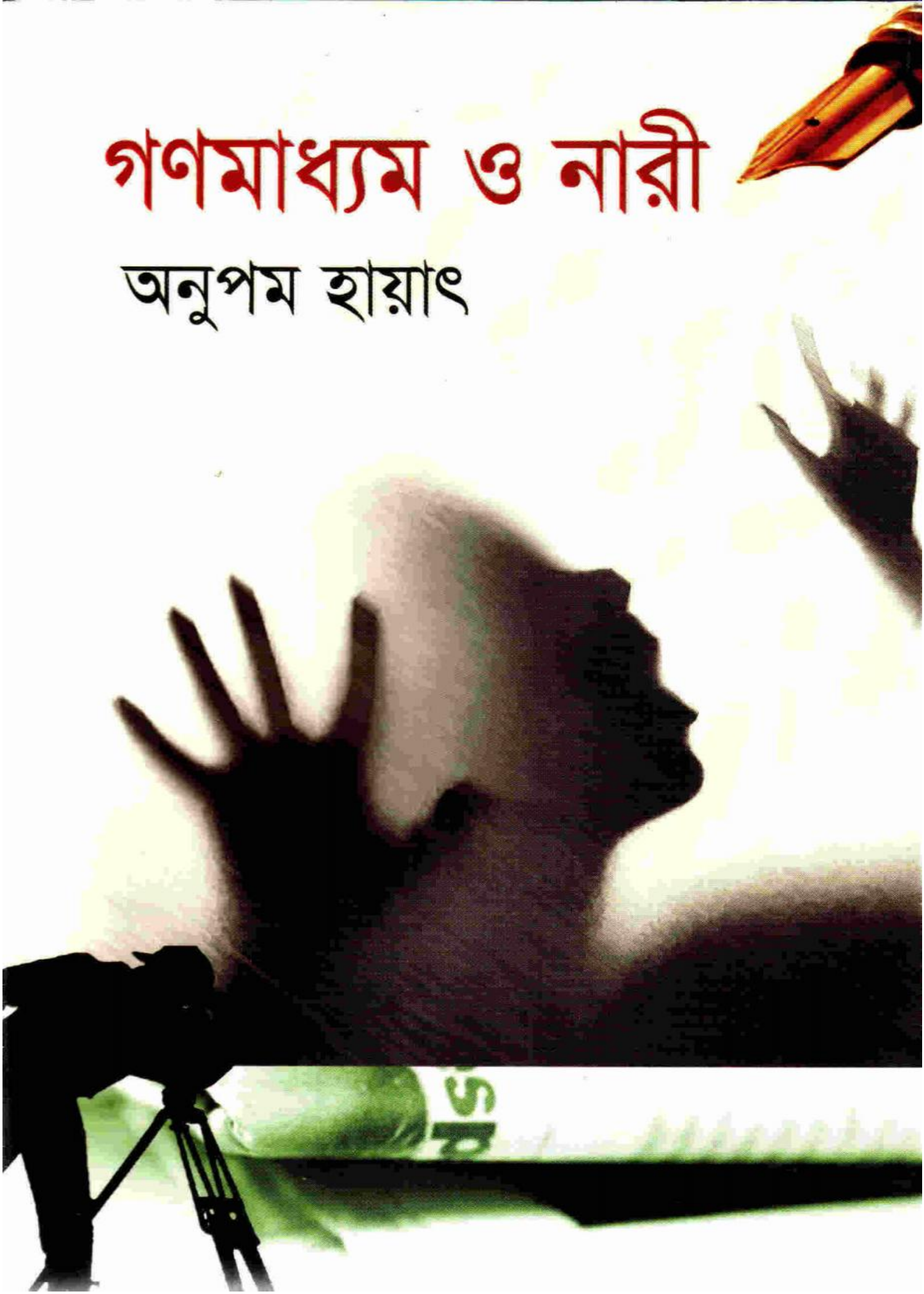

গণমাধ্যম শব্দটি গত শতকের বিশের দশকে চালু হয়। গণমাধ্যম বলতে মূলতঃ সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রকে বোঝায়। গণমাধ্যম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, উন্নয়ন, মন ও মননে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যমের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ, পরিচালন, প্রতিফলন ও ক্ষমতায়নের ব্যাপারে আমাদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অসচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট। 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থে রয়েছে তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও দলিলায়ন। জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে এটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে।

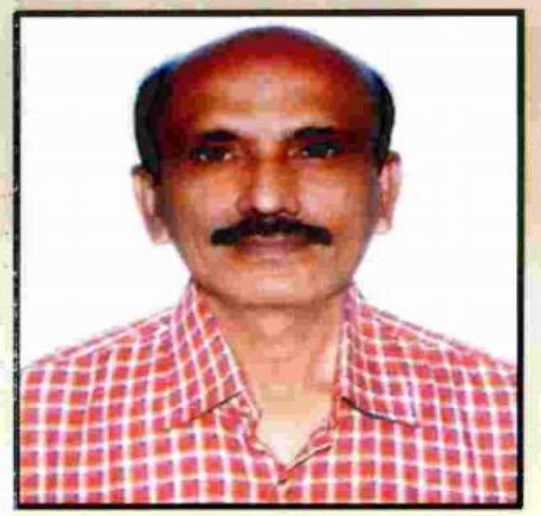

অনুপম হায়াৎ (মতিউর রহমান ভূঁইয়া)-এর জন্ম ১ জুন ১৯৫০, নারায়ণগঞ্জ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ. (সাংবাদিকতা), ডিএইচএম.এ.এস.সি (চলচ্চিত্র)। চলচ্চিত্র, নজরুল, বাঙালি মণীষীদের জীবন চরিত, ঢাকার সংস্কৃতি, গণমাধ্যম তাঁর লেখালেখি ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ৩৫টি। উল্লেখযোগ্য হলো–সপুংশক অহংকার (১৯৮০), বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস (১৯৮৭), নাট্যকার নজরুল (১৯৯৭), ফতেহ লোহানী (১৯৯৪), সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর (১৯৯৫), মেহেরবানু খানম (১৯৯৭), চলচ্চিত্র জগতে নজরুল (১৯৯৮), দোলন চাঁপার হিন্দোল (১৯৯৮), বাংলাদেশের কয়েকজন চলচ্চিত্রকর্মী (১৯৯৯), পুরানো ঢাকার সংস্কৃতিক প্রসঙ্গ (২০০১), চলচ্চিত্র বিদ্যা (২০০৪), চলচ্চিত্র সমালোচনা (২০০৬), জহির রায়হানের চলচ্চিত্র : পটভূমি, বিষয় ও বৈশিষ্ট্য (২০০৭), চিত্রনাট্যকলা (২০০৭), রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র (২০০৮), পুরানো ঢাকার রাজনীতি ও অন্যান্য (২০০৮), প্রামাণ্য নজরুল (২০০৮) প্রভৃতি।

টিসিবির সাবেক উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী (রপ্তানী, পর্ষদ, জনসংযোগ ও বাজার তথ্য), ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য, চলচ্চিত্র জুরি বোর্ডের সদস্য এবং স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া' বিভাগসহ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা ফিল্ম ইনসটিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব কমুনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনের শিক্ষক, বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত।

গণমাধ্যম ও নারী

সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন

অনুপম হায়াৎ

সমাচার
৩৭ পি কে রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

	গণমাধ্যম ও নারী
লেখক	অনুপম হায়াৎ
প্রকাশক	মোঃ শাহ্ আলম সরকার সমাচার ৩৭ পি কে রায় রোড বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন	৭১২২৯৪৭
প্রকাশকাল	ডিসেম্বর, ২০১৩
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	মশিউর রহমান
বর্ণবিন্যাস	সমাচার কম্পিউটার ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	এস. এস. বুক্স ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ উত্তর আমেরিকা পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
মুদ্রণ	গাউছিয়া প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স ৪৫/খ রজনী চৌধুরী রোড গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
মূল্য	একশত পঞ্চাশ টাকা US$ 8.00 ISBN-984-70182-0160-6

Media and Women : Newspaper, Radio, Television, Cinema & Advertising : *written by Aupam Hayat; Published by : Md. Shah Alam Sarker, Somachar, 37 P.K. Roy Road, Dhaka-1000, Bangladesh; Price : Tk. 150/-*

উ ৎ স র্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের
উজান গোপিন্দী গ্রামের
সেইসব নারীগণ
যাঁরা স্বনামে নয়, পরিচিত ছিলেন স্বামী, সন্তান ও নাতি-নাতনিদের নামে
মহাকালের পাতায় যাঁদের নাম কোনোদিন হয়তো লেখাও থাকবে না
কিন্তু
আমি তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি

দীনার মা, কেতির মা. পচার মা, কমুর মা, কাশেমের মা, গিয়াসের মা, রহিমুনের মা, আহমদের মা, বিল্লালের মা, সাফিয়ার মা, জনুর মা, হাসুর মা, খয়েরের মা, ইসমাইলের মা, মজমের মা, তারামিয়ার মা, ফালাইন্যার বউ, বাবুলের মা, মইজদ্দির বউ, জমিলার মা, তমুর মা, মজিবরের মা, ফাতেমার মা, সালামের দাদী, মালার মা, নূরার মা, মোতালিবের মা, আরেফার মা, আকাশের মা, আবদুল আলীর মা, আমজাদের মা, হাবিবুল্লাহর মা, আলবাহারের মা, ইদ্রিসের মা, পারুর মা, করিমের মা, আয়েবালীর মা, মামুদ আলীর মা, শামসুদ্দীর মা, মহব্বতের বউ, মাজেদার মা, ঝরনার মা, মোসলেমের মা, আরিফের মা, তোতার মা, গফুরের মা, কালুর মা, জয়নার মা, ইউসুফের বউ, মোস্তফার মা .....

লেখকের কথা

আধুনিক উন্নয়নমুখী ও কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে স্বাধীন গণমাধ্যমের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। এটা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কাজেই সংগত কারণেই সেই গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, পরিচালন, প্রতিফলন, রূপায়ন এবং ক্ষমতায়ন থাকাও অপরিহার্য। গণমাধ্যমে নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন উন্নয়ন ও কল্যাণ সম্ভব নয়। গণমাধ্যম গণমানুষের আকাংখা সৃষ্টি করে থাকে, তাতে যদি নারীর সক্রিয় অস্তিত্ব না থাকে তবে তা হয়ে দাঁড়ায় একপেশে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়ন নিয়ে সুশীল সমাজে উন্নততর চিন্তা-ভাবনা চলছে। এরমধ্যে রয়েছে গণমাধ্যমও। বক্ষমান 'গণমাধ্যম ও নারী' গ্রন্থটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে লেখা হয়েছে। এতে মূলত সাংবাদিকতা, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিফলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থ রচনায় এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল, অধ্যাপক ড. শরীফউদ্দীন আহমদ, ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, ড. একেএম রব্বানী ও অন্যান্যের কাছে ঋণী।

'সমাচার' প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহ আলম সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের ব্যাপারে যে-কোন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

অনুপম হায়াৎ
লেখক
'সুবর্ণগ্রাম'
৩৩/৪, পলাশপুর, ধনিয়া
ঢাকা-১২৩৬

অকটোবর, ২০১৩

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	**সংবাদপত্র**	**১১–২৩**
		সংবাদপত্রে নারীর অংশগ্রহণ	১১
		সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন	১৭
		নারীর প্রতি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার	২০
		সংবাদপত্রের ভোক্তা বা পাঠিকা	২১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**বেতার**	**২৪–৩২**
		শুরুর সেদিন	২৪
		বেতার অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ	২৬
		বেতার অনুষ্ঠান প্রযোজনা, প্রশাসন ও অন্যান্য	২৮
		বেতার অনুষ্ঠানে নারীর প্রতিফলন	৩০
		বেতার-শ্রোতা	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	:	**টেলিভিশন**	**৩৩–৪২**
		শুরুর সেদিন	৩৩
		টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ	৩৫
		টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযোজনা, পরিচালনা, প্রশাসন ও অন্যান্য	৩৭
		টেলিভিশনে নারীর প্রতিফলন	৩৮
		টেলিভিশনের ভোক্তা-দর্শক	৩৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	**চলচ্চিত্র**	**৪৩–৮৮**
		চলচ্চিত্র ও নারী : দেশে দেশে	৪৪
		ঢাকার সংস্কৃতি ও বিনোদনে নারী	৪৫
		ঢাকার চলচ্চিত্র ও নারী : আদিপর্ব	৪৬
		চলচ্চিত্রে নারী : অভিনয় ও উপস্থাপনা : অভিনয়ে পথ বেঁধে দিল যারা	৪৭
		চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন	৫৫
		চলচ্চিত্রে নারীর বিভিন্ন অবদান	৬৭
		চিত্র পরিচালনা	৬৭
		চিত্র প্রযোজনা	৭০
		কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান রচনা	৭২

	সংগীত পরিচালনা	৭২
	সঙ্গীতে কণ্ঠদান	৭২
	কারিগরি কুশলতা : চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা	৭৩
	নৃত্য পরিচালনা	৭৪
	চলচ্চিত্র দেখা	৭৪
	চলচ্চিত্র চর্চায় নারী : সাংবাদিকতা ও সমালোচনা	৮১
	চলচ্চিত্র সংসদ ও গবেষণা	৮৩
	প্রশাসন	৮৩
	উপসংহার	৮৪
পঞ্চম অধ্যায় :	**বিজ্ঞাপন**	**৮৯–৯৩**
	প্রভাব	৯২
	উপসংহার	৯২

প্রথম অধ্যায়
সংবাদপত্র

গণ মানুষ অর্থাৎ অনেক মানুষকে একই সঙ্গে যে মাধ্যম দিয়ে যোগাযোগ করা যায়, তাই গণমাধ্যম। সংবাদপত্র, সাময়িকী, বইপত্র, চিত্রকলা, আলোকচিত্র, নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত, গ্রামোফোন রেকর্ড, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, পোস্টকার্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ইন্টারনেট এসবই গণমাধ্যমের শক্তিশালী ক্ষেত্র।

গণমাধ্যম ধারণাটি আধুনিককালের। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে গণউৎপাদনের প্রসঙ্গটিও। উন্নত, শিক্ষিত, সচেতন ও মনীষা সম্পন্ন সমাজের নিদর্শন গণমাধ্যম। আধুনিক গণমাধ্যমের সূচনা হিসেবে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারকে ধরা হয়। তবে 'গণমাধ্যম' শব্দটি উনিশ শতকে সংবাদপত্রের পাশাপাশি আলোকচিত্র, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র এবং বেতার আবিষ্কার ও গণহারে তা চালুর পর বিভিন্ন মহলে উচ্চারিত হতে থাকে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'গণমাধ্যম' শব্দটি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।[১]

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ইতিহাসে বিভিন্ন গণমাধ্যমের রয়েছে অবদান। ঢাকার উন্নয়ন, বিকাশ, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পরিবেশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ঢাকার নারী সমাজ সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের ভোক্তা অর্থাৎ পাঠক, শ্রোতা, দর্শক, কর্মী, নির্মাতা, লেখক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে রেখেছেন অবদান।

গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হচ্ছে তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা প্রদান, প্রভাব বিস্তার ও ফলাবর্তন সৃষ্টি। গণমাধ্যমের থাকে প্রেরক, বার্তা, মাধ্যম ও প্রাপক।

ঢাকার চারশো বছরের ইতিহাসে সংবাদপত্রের বয়স দেড়শো বছরেরও বেশি। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ', ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা মাসিক 'কবিতা কুসুমাবলী' এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বাংলা সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'।[২] সেই থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী। এসব পত্রপত্রিকায় ঢাকার নারী-সংশ্লিষ্টতা ঘটেছে অংশগ্রহণকারী কর্মী হিসেবে, উপস্থাপিত বিষয় হিসেবে এবং ভোক্তা বা পাঠিকা হিসেবে। নিচে এই তিনটি বিষয়ে নারীর সংশ্লিষ্টতা তুলে ধরা হলো।

সংবাদপত্রে নারীর অংশগ্রহণ

সংবাদপত্র আধুনিক গণমাধ্যমের প্রাথমিক ক্ষেত্র। এটি পাঠ বা অধ্যয়ন মাধ্যম। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে শিক্ষা বা সাক্ষরতা: সম্পাদনা-প্রকাশনা থেকে শুরু করে পঠন

পর্যন্ত। অশিক্ষিত বা নিরক্ষরদের জন্য সংবাদপত্র নয়। ঢাকার 'গণমাধ্যম ও নারী' বিষয়টি নারীর শিক্ষা, সচেতনতা এবং পুরুষের আধিপত্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখতে হবে।

১৮৫৬ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনকালে ঢাকার সংবাদপত্রের ইতিহাসে কোন নারী সাংবাদিকের নাম পাওয়া যায় না। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে(১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) প্রকাশিত হয় ঢাকার প্রথম মহিলা সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ভারত মহিলা'। এটি সম্পাদনার করতেন ব্রাহ্ম মহিলা সরযুবালা দত্ত। পত্রিকাটি মহিলাদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল মহিলাদের সম-সাময়িক সমস্যাবলী। এতে অন্যান্যের মধ্যে লিখতেন অনুরূপা দেবী ও প্রতিভা নাগ।[৩]

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (১৯২৭ এর এপ্রিল) ঢাকা থেকে বিভাবতী সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সচিত্র ত্রৈমাসিক 'পাপিয়া'। পরের বছর হতে এটি মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। 'পাপিয়া' ছিল ছোটদের পত্রিকা।[৪]

ঢাকার নারী সাংবাদিকতার ইতিহাসে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর বহন করে লীলানাগ (রায়) ও তাঁর সম্পাদিক মাসিক 'জয়শ্রী'। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (১৯৩১ সালের এপ্রিল) 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হয়। এর সহ-সম্পাদিকা ছিলেন শকুন্তলা দেবী ও রেনুকা সেন।[৫]

বাংলার মহিলাদের মুখপত্র স্বরূপ 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদিকা জানান : 'মেয়েদের মধ্যে দেশাত্ববোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাবজাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'জয়শ্রী' আত্মপ্রকাশ করলো।'[৬]

লীলানাগ

লীলানাগ ছিলেন বিপ্লবী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। তাঁর 'জয়শ্রী' পত্রিকায় গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচনা করা হয়। লীলাবতী পরে গ্রেফতার হন। 'জয়শ্রী' ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাঁর অবর্তমানে মহিলারাই পত্রিকা পরিচালনা করেন এবং পরে তা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৭]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নতুন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী হয়। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকাকে কেন্দ্র করে নারী-সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৪৯ সালে ঢাকা থেকে পূর্ব বাংলার প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক 'সুলতানা' প্রকাশিত হয় সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজুর সম্পাদনায়।[৮]

১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম' প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে এটি প্রথম কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। বেগম' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তথ্য জগতে বা গণমাধ্যমে পেশাগতভাবে নারীর প্রবেশ অনেকটা নিশ্চিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে অনেক নারী সাংবাদিক কর্মীর আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৯]

সুফিয়া কামাল

প্রথমে বেগমের সম্পাদিকা ছিলেন সুফিয়া কামাল, পরে সম্পাদিকা হন নূরজাহান বেগম। ঢাকা তথা অবিভক্ত উপমহাদেশে নূরজাহান বেগম মুসলিম নারী সাংবাদিকতার ইতিহাসে অগ্রণী স্থপতি হিসেবে কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

নূরজাহান বেগম

১৯৫২ সালের মে মাসে ঢাকা থেকে জাহানারা ইমামের সম্পাদনায় মাসিক 'খাওয়াতীন' প্রকাশিত হয়। এর সহ-সম্পাদিকা ছিলেন রাবেয়া খাতুন (পরবর্তীকালের সাহিত্যিক)। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল 'অজ্ঞ সমাজের মেয়েদের চোখে জ্ঞানের আলো জ্বালানো'।[১০]

জাহানারা ইমাম

রাবেয়া খাতুন পরে ঢাকার 'সিনেমা' মাসিক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদিকা হন (১৯৫৬) এবং বেতার ও টেলিভিশন গণমাধ্যমের একজন প্রভাবশালী লেখিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম চলচ্চিত্র মাসিক সিনেমা ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তখন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুম্বাইর অভিনেত্রী নাসিম বানু। পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন জেব-উন-নেসা খানম।

১৯৪৭এর পর ঢাকা থেকে নারীদের দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিল আজিজা বেগম সম্পাদিত 'মালঞ্চ', আয়েশা আমিন সম্পাদিত 'গৃহশ্রী', বেগম আয়েশা সরদারের 'শতদল', খালেদা মঞ্জুর-এ খুদার 'অজানা', কামরুন্নাহার লাইলীর 'অবরুদ্ধা', ফেরদৌসী বেগমের 'আঁচল', লায়লা সামাদের 'অনন্যা', স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে ষাটের দশকে সেলিনা পারভিন সম্পাদিত 'শিলালিপি' এবং স্বাধীনতার পর তাসমিমা হোসেন সম্পাদিত (নির্বাহী সম্পাদক দিল মনোয়ারা মনু) 'অনন্যা'। ১১ এছাড়াও পঞ্চাশ দশকে মাহফুজা খাতুনের মাসিক 'নওবাহার', ফৌজিয়া সামাদের মাসিক 'মুকুল', সত্তর দশকে ফওজিয়া সাত্তারের সম্পাদনায় মাসিক 'সমীপেষু' ও সাপ্তাহিক 'ললনা' এবং লায়লা সামাদের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'চিত্রিতা' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা থেকে মহিলাদের সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় আরো কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে সাজু হোসেনের 'রোববার' ও ফুল্লরা বেগম ফ্লোরার 'বর্তমান দিনকাল' তাসলিমা হোসেনের 'অনন্যা'।

লায়লা সামাদ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমাধারী লায়লা সামাদ (১৯২৮-১৯৮৯) ঢাকায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সাপ্তাহিক বেগম'এর সহ-সম্পাদক এবং ১৯৫২ সালে দৈনিক সংবাদ-এ স্টাফ রিপোর্টার পদে যোগ দেন। তিনি ঢাকা তথা বাংলাদেশের বাংলা দৈনিকের প্রথম নারী সাংবাদিক। তিনি সম্পাদনা করেন মাসিক 'অনন্যা' (১৯৫৪-৫৮) এবং পাক্ষিক 'চিত্রিতা' (১৯৬৯-১৯৭১)। এছাড়াও তিনি দৈনিক 'পূর্বদেশ' এর শিশু বিভাগ, 'দৈনিক বাংলার মহিলা বিভাগ', সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'র মহিলা বিভাগ পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট ছোটগল্পকার।[১২]

ঢাকার চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ইতিহাসে অগ্রণী নারী সাংবাদিক হিসেবে কীর্তিত হয়ে আছেন হুসনা বানু খানম। তিনি সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই জড়িত ছিলেন। ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় অন্যতম অগ্রণী নারী সাংবাদিক হিসেবে গর্বিত হয়েছেন মাফরুহা চৌধুরী, তিনি ১৯৫০ দশকে দৈনিক 'মিল্লাত' পত্রিকায় যোগ দেন মহিলা বিভাগের পরিচালক হিসেবে। পরে তিনি সহকারী সম্পাদক হন 'দৈনিক পাকিস্তান' (১৯৬৫) ও 'দৈনিক বাংলা'র (১৯৭২)।[১৩]

মাফরুহা চৌধুরী

ষাটের দশকে হাসিনা আশরাফ, সেতারা মূসা, তাহমিনা সাঈদ এবং সত্তর দশকে বেবী মওদুদ, নাসিমুন আরা, রওশন আরা, মাসুমা খানম প্রমুখ ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন পদে পেশাগত জীবন শুরু করেন। দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার বার্তা বিভাগে পালা প্রধান হিসেবে নাসিমুন নাহার নিনি পুরুষের পাশাপাশি রাতের শিফটেও দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকে বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা বিভাগ, ফিচার ও সম্পাদকীয় বিভাগে নারীদের নিয়োগ বাড়তে থাকে। এঁদের মধ্যে দৈনিক 'মুক্তকণ্ঠে' বার্তা বিভাগের প্রধান হিসেবে আখতার জাহান মালিক, দৈনিক 'জনকণ্ঠে'র অর্থনীতি পাতার দায়িত্বে পারভীন সুলতানা ও ক্রীড়া প্রতিবেদক হিসেবে মনিজা রহমান, দৈনিক 'দিনকালে'র কূটনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে মাহমুদা চৌধুরী (তিনি বিচিত্রা, সংবাদ-এ চলচ্চিত্র সমালোচনা করে ইতোপূর্বে সুনাম অর্জন করেন) 'জনকণ্ঠ' ও 'যুগান্তরে'র সহকারী সম্পাদক, গুলশান আখতার 'দৈনিক বাংলা'র সহকারী সম্পাদক কণিকা মাহফুজ, 'দৈনিক ভোরের কাগজ' ও 'প্রথম আলো'র সুমনা শারমিন, 'জনকণ্ঠে'র অদিতি রহমান, 'দৈনিক জনতা'র রোজী ফেরদৌস, 'ডেইলি স্টারে'র ম্যাগাজিন সম্পাদক আয়শা মেহেরিন আমিন, 'মর্নিং নিউজ' ও 'বাংলাদেশ টাইমসে'র প্রতিবেদক ফায়জা হক, বিএসএসের জুনান নাশিত, 'দৈনিক ইনকিলাবে'র মকবুলা পারভীন ও আরজিনা রহমান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ' সহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণমাধ্যম বিষয়ের পাঠ্যক্রম চালু হলে ১৯৭০ দশক থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বহুসংখ্যক নারী সাংবাদিক উচ্চস্তরে পদ্ধতিগত শিক্ষা নিয়ে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চ্যালেঞ্জিংভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে নারী সাংবাদিকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের অংশগ্রহণ করাকে সহায়তা করেছে। এ প্রসঙ্গে আলোকচিত্র সাংবাদিকতায় নারীর অংশগ্রহণও লক্ষ্যণীয়। সাঈদা খানম সেই ১৯৫০ দশক থেকে সাপ্তাহিক 'বেগম', চিত্রালী' এবং অন্যান্য পত্রিকায় আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবে কাজ করে অগ্রণী হয়েছে আছেন। আলোকচিত্রী শিরিন সুলতানা সাপ্তাহিক 'সচিত্র সন্ধানী' থেকে শুরু করে 'দৈনিক মিল্লাত'এ কাজ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে।

সাঈদা খানম

শামীমা চৌধুরী সূত্রে জানা যায় ১৯৮৭ সালে ঢাকা মহানগরীতে ৯০০ সাংবাদিকদের মধ্যে ৩৪ জন ছিলেন নারী। অর্থাৎ ৪ শতাংশে নারী। ১৯৯৭ সালে ছিল ১৫০০ সাংবাদিকের মধ্যে ৬০ জন নারী।[১৫] সীমা মোসলেমের সূত্রে জানা যায় ২০০৮ সালে ঢাকার ১০টি পত্রিকার মধ্যে প্রতিবেদক ২২ জন, সাব-এডিটর ৩৯ জন, সিনিয়র সাব এডিটর ৪ জন, ফিচার এডিটর ৫ জন, ফিচার বিভাগ ৩২ জন, শিফট ইন চার্জ ১ জন, এডিটরিয়াল এসিসট্যান্ট ৫ জন, এসিসট্যান্ট এডিটর সহ সর্বমোট ১০৯ জন নারী।[১৬]

তাসমিমা হোসেন

২০১৩ সালে ঢাকায় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা নিঃসন্দেহে আরো অনেক বেড়েছে। এর কারণ সামাজিক সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কর্মরত পেশাজীবী নারী সাংবাদিক ছাড়াও পত্র-পত্রিকার সঙ্গে নারীদের সংশ্লিষ্টতা লেখালেখির (সাহিত্য চর্চাসহ) সূত্রে অনেক নারীই পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে পেয়েছেন অর্থ ও খ্যাতি। যেমন জাহানারা ইমাম (মরহুমা), হোসনে আরা শাহেদ, তসলিমা নাসরীন।

সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন

সাধারণত সংবাদপত্রে নারীর অধঃস্তন রূপটি দেখা যায়। এর প্রধাণ কারণ সমাজের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ভেতর থেকেই সংবাদপত্র কাজ করে থাকে।

ঢাকার সংবাদপত্রের দেড়শতাধিক বছরের (১৮৫৬-২০১৩) ইতিহাসে বিভিন্ন সংবাদ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, ফিচার, আলোচনা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পুরুষেরই আধিপত্য। পুরুষ আধিপত্যের কারণে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এমনকি মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক ধরনের নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে।

উনিশ শতকে পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় উদার ও সংস্কারপন্থীরা সীমিত পর্যায়ে নারীশিক্ষা ও অধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে নারীরা বাইরের পেশার সঙ্গে জড়িত হোক তারা এটা চাননি। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কাছাকাছি লোনসিংহ (বিক্রমপুর/ফরিদপুরের) থেকে ব্রাহ্মকর্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অবলাবান্ধব'। এই পত্রিকার মূল সূর ছিল স্ত্রী স্বাধীনতা।[১৭]

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে মাসিক 'নারীশিক্ষা' প্রকাশিত হয়।[১৮] এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয় কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বালিকা' নামে পত্রিকা।[১৯] এসব পত্রিকায় নারীর উপস্থাপনা ছিল শিক্ষাকেন্দ্রিক। উনিশ ও বিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১-১৯৬০) এ নারী শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা এবং নারী সংশ্লিষ্ট অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। এ ধরনের সংবাদের শিরোনাম (কয়েকটি) উল্লেখ করা হলো: ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল (১৪.০৫.১৮৬৩), স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা (২১.০৫.১৮৬৩), স্ত্রী শিক্ষা ও প্রাচীন সম্প্রদায় (১৮.০৬.১৮৬৬), ঢাকার যুবতী বিদ্যালয় (০৩.০৬.১৮৬৫), ঢাকার স্ত্রী শিক্ষা (০৫.০৬.১৮৭০), শাঁখারী বাজারের বালিকা হত্যা (০১.০১.১৮৭১), বেশ্যা শাসনের আবশ্যকতা (০৭.১১.১৮৮০), ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা পরীক্ষার ফল (১১.০৯.১৮৮১), বিধবা বিবাহের উৎসাহ প্রদর্শনার্থ প্রতিজ্ঞা (০৫.০২.১৮৮২), বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ (০৭.১১.১৮৮৬), বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ কথা (২১.০৮.১৮৮৭), বিধবা বিবাহ আইন (০১.০১.১৮৮৮)। সহবাস সম্মতি আইন সংক্রান্ত সংবাদ (পক্ষে ও বিপক্ষে) (১৮.০১.১৮৯১, ০১.০২.১৯৮১, ২৯.০৩.১৮৯১)।[২০]

বিশ শতকের সূচনাতে ঢাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে– বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলীয় কর্মকান্ডে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উপমহাদেশীয় ও বিশ্বব্যাপী নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে নারীর স্বাধীনতা অধিকার, শিক্ষা, অর্থনৈতিক মুক্তি, পেশাগত স্বাবলম্বন ইত্যাদি বিষয়গুলো সামনে চলে আসে। এর প্রভাব পড়ে ঢাকার সংবাদপত্রেও। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে মহিলাদের সম্পাদনায় প্রথম মাসিক সংবাদপত্র 'ভারত মহিলা' প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় মহিলা সম্পাদিত মাসিক 'জয়শ্রী'। দুটো পত্রিকাতেই নারীর উপস্থাপনা যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৯৩০ দশকে পুরুষদের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'চাবুক', 'বাংলার বাণী' ও 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় নারীদের সংবাদ, লেখা ও বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় একটি বিভাগের নাম রাখা হয় 'মহিলা মহল'। এই পত্রিকায় কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের প্রিন্সিপাল সুজাতা রায়ের পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রীদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং চার সন্তানের জননী বনলতা দেবীর প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের সংবাদ ছাপা হয়েছে।[২১]

১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দৈনিক ও মহিলা পত্রিকা। এসময় নারীর উপস্থাপনের বিষয়টি পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানী আদর্শে ধর্ম-কর্মে সুনিপুনা স্বামী-সংসার-সন্তানসহ 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে' ইমেজ প্রাধান্য পায়। দৈনিক আজাদ, দৈনিক মিল্লাত, দৈনিক ইত্তেফাক, পাকিস্তান অবজারভার, মর্নিং নিউজ, দৈনিক সংবাদে মহিলা বিভাগ খোলা হয়। এসব পত্রিকায় মহিলাদের রূপসজ্জা, গৃহসজ্জা, শিশুর যত্ন, সেলাই কাজ, চাটনি-মোরব্বা তৈরি এসবের ওপর গুরুত্ব দিয়ে লেখা ছাপ হতো। নারীদের আলোকচিত্র ছাপা হতো শুভ বিবাহ অথবা সুন্দরী হিসেবে। তবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকার নাট্যমঞ্চ, চলচ্চিত্র, বেতার, ক্রীড়া, ভাষা আন্দোলন, রাজনৈতিক আলোচনা ও টিভিতে নারীদের অংশগ্রহণের কারণে সংবাদ এবং আলোকচিত্রে নারীরা ক্রমেই গুরুত্ব পেতে থাকে। ওই সময় কোনো সংবাদ ও আলোকচিত্রে নারীকে হেয় বা অশালীনভাবে উপস্থাপনের ঘটনা ছিল বিরল।

১৯৭১ সালে রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে ঢাকার সংবাদপত্রে নারী বিষয়টি নতুন মাত্রা পায়। ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার ও নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগে একশ্রেণীর সংবাদপত্রে নারীকে বিভিন্ন আইটেমে (সংবাদ, শব্দপ্রয়োগ, আলোকচিত্র) খণ্ডিত, দুর্বল ও বিকৃতভাবে উপস্থাপনও করে।

আরিফা শারমীন ও রোবায়েত ফেরদৌস ২০০০ সালের জানুয়ারী-জুন সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত আটটি দৈনিক পত্রিকার আধেয় বিশ্লেষণ করেছেন।[২২] গবেষকদ্বয় দেখিয়েছেন যে আটটি সংখ্যাতেই নারী বিষয়ক সংবাদ কম গুরুত্ব পেয়েছে, স্বল্পস্থান বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ভেতরের পাতায় ছোট করে ছাপা হয়েছে। সবগুলো কাগজেই প্রধানত ঘটনার শিকার হিসেবে নারী উপস্থাপিত, নির্যাতনমূলক সংবাদের আধিক্য, অকারণে ও যুক্তিহীনভাবে নারী সংক্রান্ত আলোকচিত্রের ব্যবহার, ক্রীড়া ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৈপূণ্যের চেয়ে যৌনআবেদনময়ী করে ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবাদপত্রে নারীর এই অধিকতর দৃশ্যমানতার পাশাপাশি রয়েছে অতি বিশেষায়ণে প্রান্তিকীকরণও। তাঁদের গবেষণার পূর্বানুমান ছিল:

১। সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন লিঙ্গীয় পক্ষপাতদুষ্ট।

২। সংবাদপত্রে 'নারী সংবাদ' ও 'নারী সংশ্লিষ্ট আইটেম'এর উপস্থিতি কম।

৩। সংবাদপত্রে নারীকে বিকৃত ও খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

৪। সংবাদের সক্রিয় নির্মাতা হিসেবে নারীর উপস্থিতি নগণ্য

৫। সংবাদপত্রে প্রধানত অপরাধ, বিনোদন ও যৌনতার প্রতীক হিসেবেই নারী উপস্থাপিত হয়।

৬। দুর্বল, অসহায়, নিষ্ক্রিয়, ঘটনার শিকার এবং অধস্তন মানুষ হিসেবে নারীর গতানুগতিক ও সনাতনী ইমেজই সংবাদপত্র পুনরুৎপাদন করে চলে।

৭। নারী সংবাদ ও নারী সংশ্লিষ্ট আইটেম যথার্থ ট্রিটমেন্ট পায় না।

৮। প্রকাশিত ছবিতেও নারীকে মূলত অসহায়, নিষ্ক্রিয় এবং যৌনতার প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরা হয়।[২৩]

আলোচ্য গবেষণায় বিভিন্ন দৈনিকে নারীর উপস্থাপন এবং অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার, সম্পর্কও আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে-

> অন্যান্য কাগজের তুলনায় 'মানবজমিনে' যৌনতার প্রতীকা হিসেবে নারীকে উপস্থাপিত করবার ঝোঁক বেশি লক্ষণীয়। 'ইত্তেফাক' ও 'ইনকিলাবে' নারীর মাতৃত্ব, সন্তান পালন ও গৃহস্থালিকেন্দ্রিক ইমেজ উপস্থাপিত হয়েছে। নারীকে নিষ্ক্রিয়, কোমল ও দুর্বল হিসেবে প্রতিফলিত করবার ঝোঁকও এসব সংবাদপত্রে লক্ষণীয়। 'প্রথম আলো', 'ভোরের কাগজ' ও 'ডেইলি স্টার' পত্রিকায় নারীর প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে 'অবজারভারে'র ভূমিকা গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত নয়।

নারীর প্রতি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার

সংবাদপত্র সংবাদ পরিবেশনের সময় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সচেতন নয়। গবেষণাধীন সংবাদপত্রের আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত শব্দসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে যা সমাজে নারীর নেতিবাচক অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতেই ভূমিকা রাখবে। ৮টি পত্রিকার সংবাদ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত শব্দ ও বাক্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে :

'নারী ও শিশু প্রকৃতিগত কারণে সমাজে সর্বাপেক্ষা অসহায় অংশ', 'নারী ঘটিত কেলেঙ্কারি', 'চরিত্রহীনা', 'তিনমাস পূর্বে জনৈক বাংলাদেশী যুবকের হাত ধরিয়া ঘরে ছাড়িয়া গিয়াছেন', 'তাহার নাম শুনিলে এদেশের তরুণী কিশোরীদের ঘুম যেন হারাম হইয়া যায়', 'সম্ভ্রমহানী', 'ইজ্জতের নিরাপত্তা', 'সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ', 'সুন্দরী গৃহবধূ', 'প্রমোদ বালা', 'লালসা পূরণ', 'দেহ ব্যবসায়ী', 'ছলনাময়ী', 'ঝাঁপিয়ে পড়া'. 'ধর্ষণের ঘটনায় বর্ণনায় 'পুরোরোত', 'পর্যায়ক্রমে', 'ভিকটিমের সতীচ্ছেদ হয়েছে', 'ফষ্টি-নষ্টি', পরনের শাড়ি খুলে অর্ধ উলঙ্গ করে', 'দেহ মিলন', 'ঘন হয়েছে সম্পর্ক', 'পুরনো যৌবন', 'Near perfect body'।[২৪]

সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপনের আরেকটি বিষয় হলো বিজ্ঞাপন। পণ্যের বিপণনের ক্ষেত্রে উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে পণ্যের যথাযথ পরিচিতি, মান ও গুণের বিবরণ প্রদানই মুখ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ঢাকার সংবাদপত্রে দেখা যায় পণ্যের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমা সর্বস্ব নারীর ব্যবহার। এক্ষেত্রে গাড়ির টায়ারের সঙ্গে অর্ধউলঙ্গ নারীদেহের ব্যবহার যখন রুচিহীনতার পরিচায়ক তখন লোমনাশক ঔষধের সঙ্গে বা সাবানের সাথে নারীর শরীরের বিশেষ অঙ্গের মুদ্রণ ও অশ্লীলতার পরিচায়ক।

পণ্য ছাড়া নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে 'পাত্র-পাত্র চাই' বিজ্ঞাপনেও। আগে অবশ্য 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সামাজিক অবস্থান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভাব, চাহিদা ও অন্যান্য কারণে বিবাহ বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

কাবেরী গায়েন 'পাত্র-পাত্রী চাই' সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবাহ বিজ্ঞাপনের লৈঙ্গিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিয়ের বাজারে নারী মানুষ নয়, যেন পণ্য, বয়সে টাটকা, রঙে ফর্সা, ধর্মপ্রাণ, গৃহ কর্মে সুনিপুণা, ধনীর দুলালী।[২৫]

তিনি ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ইত্তেফাক', 'জনকণ্ঠ', 'ইনকিলাব' ও 'প্রথম আলো'র হতে ৪৪৬টি 'পাত্র চাই/পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন নারীর মূল্যায়ন পুরুষের তুলনায় কতটা নিচে। ... বিয়ের বাজারে নারী অবশ্যই এক ধরনের পণ্য · নিষ্ক্রিয় পণ্য। কাজেই একজন নারী পণ্যের দরদাম ঠিক হয় অন্যান্য নারী পণ্যের সঙ্গে তুলনা করে। অন্য নারীর চেয়ে কত বেশি রূপসী, সুন্দুরী, আবেদনময়ী ও লাস্যময়ী তার ওপর নির্ভর করে ...'।[২৬]

সংবাদপত্রের ভোক্তা বা পাঠিকা

ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম সংবাদপত্রের ভোক্তা বা পাঠিকা হিসেবে নারীর রয়েছে অবদান। ঢাকার শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক গোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী। তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা, লেখালেখির সূত্রে তারা পত্রিকাপাঠের সঙ্গে জড়িত। পত্রিকাপাঠ মারফত তারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ জানতে পারে, জানতে পারে নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু, পড়তে পারে কবিতা, গল্প। ঢাকার কর্মব্যস্ত গৃহিণীদের অনেকেরই অবসরের সঙ্গী পত্র-পত্রিকা। সাধারণতঃ তাদের পছন্দের পত্রিকাটিই পরিবারের মধ্যে নিয়মিত রাখা হয়। বলা যায় ঢাকার নারী সমাজ ঢাকার পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যায় কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকে সাপ্তাহিক 'বেগম'ই ছিল নারীদের অবশ্য পাঠ্য পত্রিকা। সংবাদপত্রের পাঠিকাদের মতামত জানা যায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় লিখিত চিঠিপত্র, প্রশ্নোত্তর, অভিমত বিভাগ থেকে। এসব বিভাগের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানের পাঠিকারাও নারী বিষয়ক সমস্যাসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লিখে থাকেন। তারা অশ্লীল ছবি ছাপার বিরুদ্ধেও কলম ধরে থাকেন। তবে দুর্ভাগ্য যে সংবাদপত্রের পাঠিকাদের নিয়ে কোনো গবেষণা বা জরীপ হয়নি। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন যথার্থই লিখেছেন, নারীও যে সংবাদপত্রের পাঠক তা ধারণা ও বর্ণনায় উপেক্ষিত।[২৭]

তবে সংবাদপত্রের সিরিয়াস পাঠক হিসেবে ঢাকাবাসী এবং ঢাকা প্রবাসী অনেক খ্যাতিমান নারী লেখক-গবেষক-শিক্ষকদের লেখায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সুফিয়া কামাল, শামসুন্নাহার মাহমুদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, নুরজাহান বেগম, মাফরূহা চৌধুরী, লায়লা সামাদ, জাহানারা ইমাম, আখতার ইমাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায় সংবাদপত্রের নিবিষ্ট ভোক্তা বা পাঠিকা হিসেবে।

প্রশাসন, গবেষণা ও শিক্ষকতায় নারী

যুগের দাবী ও উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশের নারীরাও সাংবাদিকতায় প্রশাসন, গবেষণা ও শিক্ষকতার সাথে যুক্ত হয়েছেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের তথ্য ক্যাডারে ১৯৭০ দশক থেকে অদ্যাবধি বহু নারী সরকারের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন–তথ্য মন্ত্রণালয়, ডিএফপি, পিআইবি, এফডিসি, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, জাতীয় গণমাধ্যম

ইনসটিটিউট, পিআইডিতে বিভিন্ন পদে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এক্ষেত্রে নাম করা যায় কামরুন্নাহার, হাফিজা আখতার, হোসনেআরা আখতার প্রমুখের। সাংবাদিকতায়, গবেষণায় এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবেও বহু নারী যুক্ত হয়ে দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। যেমন– গীতিআরা নাসরীন, কাবেরী গায়েন, সীমা মোসলেম, সিতারা পারভীন, শামীমা চৌধুরী প্রমুখ।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াল্টার লিপম্যান রচিত যুগান্তকারী গ্রন্থ '*পাবলিক ওপিনিয়ন*' প্রকাশিত হয়। ওই বছরই '*অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী*'তে *ম্যাস মিডিয়া* বা গণমাধ্যম শব্দটি যুক্ত হয়। উদ্ধৃত, দীপঙ্কর সিংহ, *মিডিয়া সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৮৩।

২. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, ১ খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৪৮-৫০ ও ৭৮।

৩. গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগঃ পিআইবি, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস*, নিরীক্ষা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ১৯৯৬, পৃঃ২৫।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী*, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ১৯।

৫. দীপঙ্কর মোহান্ত, লীলানাগ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৬।

৬. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ৫৬।

৭. প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃঃ৬১-৬২।

৮. মাসুমা খানম, *সাংবাদিকতায় নারীঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, নিরীক্ষা, জানুয়ারী, ঢাকা ২০০৯, পৃঃ ৩৬-৩৭।

৯. শামীমা চৌধুরী, *সংবাদ মাধ্যমে নারী, পথ চলার বাধা কোথায়*, নিরীক্ষা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃঃ১০।

১০. রাবেয়া খাতুন, *স্বপ্নের শহর ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ৮৮-৯৫।

১১. শান্তা মারিয়া, *সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের নারী*, নিরীক্ষা, ঢাকা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃঃ ১২-১৩।

১২. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলা একাডেমী চরিত্রাভিধান*, ঢাকা ১৯৭৭, পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯।

১৩. মাফরুহা চৌধুরী, *স্মৃতিকথা*, নূরুন্নাহার ফয়জননেসা ও অন্যান্য সম্পাদিত *কালের সমুখ ভেলা*, ঢাকা ১৯৮৮, পৃঃ ১৮২-১৮৫।

১৪. শান্তা মারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৮ ও শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত এবং অন্যান্য সূত্র।

১৫. শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১৬. সীমা মোসলেম, *বাংলাদেশের সংবাদপত্রে নারীর অবস্থান, একটি পর্যবেক্ষণ*, নিরীক্ষা, ঢাকা মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃঃ ৪-৫।

১৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র* (১৮৪৭-১৯০৫), ১খন্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৮৬।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।

২০. প্রাগুক্ত, ৪ খন্ড, পরিশিষ্ট-১, পৃ: ৫৮৯-৬৪৫।

২১. সাপ্তাহিক '*বাংলার বাণী*' (সম্পাদক নলিনী কিশোর গুহ) ঢাকা, ১০ আষাঢ়, ১৩৩৮ ও ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৯ বঙ্গাব্দ।

২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আরিফা শারমীন ও রোবায়েত ফেরদৌসের প্রবন্ধ '*সংবাদপত্রে নারী: সমস্যা ও সুপারিশ*'; গীতিআরা নাসরীন ও অন্যান্য সম্পাদিত '*গণমাধ্যম ও জনসমাজ*' ঢাকা ২০০২, পৃ: ১৩০-১৪৪।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩১।

২৩ক. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬।

২৫. কাবেরী গায়েন, *পাত্র পাত্রী চাই: সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবাহ-বিজ্ঞাপনের লৈঙ্গিক-সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ*, গীতিআরা নাসরীন ও অন্যান্য সম্পাদিত *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*, ঢাকা ২০০২, পৃ: ১৪৫-১৬২।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৭।

২৭. আহমদ হুমায়ূন, উদ্ধৃত, অলিউর রহমান, *বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারী প্রকৃতি*, নিরীক্ষা, মার্চ-এপ্রিল ২০০৮, ঢাকা, পৃ:১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেতার

বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার বেতার। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রধান দু'টি বাহনের মধ্যে বেতার একটি, অন্যটি টেলিভিশন। শ্রুতি নির্ভর বেতার গণমাধ্যমটি শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সব ধরনের (বধির বাদে) শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় ও ফলদায়ক। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র', (তখন এই নামেই পরিচিত) স্থাপিত হয়। ঢাকার বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এই গণমাধ্যমে নারীরা নানাভাবে এর প্রসার-প্রচার ও উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে বেতারের পাশাপাশি একুশ শতকের সূচনাতে ঢাকার কয়েকটি বেসরকারী বেতার কেন্দ্রও চালু হয়েছে। ফলে বেতারে নারী সংশ্লিষ্টতা আরো বেড়েছে। বেতারে নারী সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি নারীর অংশগ্রহণ, প্রযোজনা ও প্রশাসন, প্রতিফলন ও শ্রোতা হিসেবে আলোকপাত করা হবে।

শুরুর সেদিন

সেই ঔপনিবেশিক আমলে রক্ষণশীল মফস্বল শহর ঢাকায় বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা নারীদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেয় মেধা ও মননের বিকাশ, নিজেকে পরিচিত করার ও স্বাবলম্বী হওয়ার। বেতার কেন্দ্র চালুর প্রথম দিন থেকেই ঢাকার নারী শিল্পীরা জড়িত হন। এ সম্পর্কে স্মৃতিময় বর্ণনা পাওয়া যায় সঙ্গীতজ্ঞ লায়লা আর্জুমান্দ বানুর লেখায়। তিনি লিখেছেন :

> "১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবেমাত্র ধ্বংসের নিশান উড়িয়ে ইউরোপে তান্ডব নৃত্য শুরু করেছে। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়, রাস্তাঘাটে, ঘরে-বাইরে শুধু লড়াইয়ের খবর। ঠিক এই সময় ঢাকায় রাস্তাঘাটে, বাইরে আর জোর খবর, ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হবে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ ডিসেম্বর থেকে। আমি তখন ইডেন হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।
>
> এক বছর আগে ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি ঘোড়াগাড়ি করে বাবা আমাদের একবার মীরপুরের দিকে বেড়াতে নিয়ে যান। ঢাকা থেকে মীরপুর যাওয়ার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তার দু'ধারে তখন মানুষের বসতি সহজে চোখে পড়ত না। মীরপুর মাজার শরীফের চারপাশের জঙ্গলে চিতাবাঘ হানা দিত। ঢাকা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মীরপুর রাস্তার পাশে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে উঠেছিল ঢাকা বেতার কেন্দ্রের পাঁচ কিলোহার্জ শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার। ট্রান্সমিটার তৈরির কাজ তখন চলছিল পুরোদমে। বাবা আমাকে ট্রান্সমিটারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই দেখ উঁচু লোহার থামের মতো ওটাই হচ্ছে, রেডিও ট্রান্সমিটার মাস্ট'। এখান থেকে

গান বাজনা প্রচারিত হবে। তোমাকে যত্ন করে গান শেখাচ্ছি, তোমার গান হয়তো একদিন এখান থেকে প্রচারিত হবে। আর কত দূরদেশের লোক সে গান ঘরে বসেই শুনতে পাবে। তখন বাবার কথাগুলো রূপকথার মতো মনকে কতই না দোলা দিয়েছিল।

তারপর এলো ১৬ ডিসেম্বর। প্রথমবারের মতো ঘোষক ত্রিলোচন বাবু মাইক্রোফোনের সামনে বললেন, 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র।' পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো ও গোড়াপত্তন হলো এক নতুন শিল্পী আন্দোলনের। বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের বাণী দিয়ে। তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হকের ভাষণ। ঢাকা শহরে সেদিন এক নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের বন্যা বয়ে গেল। যাদের বাড়িতে বেতার যন্ত্র ছিল তাদের বাড়িতে এবং পাশের রাস্তায় লোকে ভিড় জমালো।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে যারা অংশ নেন তাঁদের সকলের নাম আমার মনে নেই, তবে মনে আছে সঙ্গীতে অংশ নেন ওস্তাদ গুল মোহাম্মদ খান, উৎপলা ঘোষ (বর্তমানে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী উৎপলা সেন), কল্যাণী দাস (বর্তমানে বিখ্যাত বাংলার জনপ্রিয় লঘু সঙ্গীত শিল্পী কল্যানী মজুমদার)। তখনকার দিনে উৎপলা ঘোষ ও কল্যাণী দাস দুজনেই বেশ ভাল খেয়াল, ঠুমরী ও দাদরা গাইতেন।

আরও মনে পড়ে প্রথম দিন সুধীর সরকার (পরে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের পল্লী মঙ্গল আসরের পরিচালক) রচিত একাঙ্কিকা 'দুয়ে দুয়ে পাঁচ' অভিনীত হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমোদ দাস গুপ্ত, বিপুল দত্ত গুপ্ত, নির্মল সেন, সুধীর রায় এবং সংযুক্তা সেন।

লায়লা আরজুমান্দ বানু ও দুই সহোদরা

ঢাকা বেতারের প্রথম দিনে খেলাঘর আসরে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেলাম আমি, অঞ্জলি ও রেবা নামের একটি মেয়ে। অঞ্জলি এখনও ঢাকা বেতারের শিল্পী। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ঢাকা বেতারের সেই ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় আমরা তিনটি ছোট মেয়ে এক সঙ্গে বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা অনিল ভট্টাচার্যের লেখা যে দুটো গান গেয়েছিলাম সে গান দু'টি এখনও আমার মনে পড়ে। গান দুটির সুর দেন অনিল ভট্টাচার্যের ছোট ভাই নির্মল ভট্টাচার্য।

প্রথম গানটির কয়েকটি লাইন হলো :

"খেলার সাথী এসো এসো
আমার খেলা ঘরে
খেলার ডালি সাজিয়ে আছি
বসে তোমার তরে।
খেলার ফুলে মালা গেঁথে
খেলার আসন দেব পেতে
খেলার প্রদীপ জ্বেলেছি আজ
অনেক আশা ভরে।"

এ গান ছাড়াও সমবেত কণ্ঠে আমরা গেয়েছিলাম 'বাংলাদেশের মেয়ে মোরা ঝর্ণা গানে চলি' প্রথম দিনে অনুষ্ঠান পরিচালকের হাতে রয়ে গেল প্রায় মিনিট দশেক সময়। তখনকার দিনে ছোটদের লেখা গান এবং সুর দুটোরই অভাব। তাই যখন আমাকে একা একটি গান গাইতে বলা হলো, তখন আমার সংকীর্ণ গানের খাতায় একটি গানের ওপর নজর পড়লো, তাই গেয়ে ফেললাম। এটিই রেডিও থেকে আমার প্রথম একা গাওয়া গান। গানটি নজরুল ইসলামের লেখা তখনকার দিনে জনপ্রিয় :

"নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল
মলিন হয়েছে ঘুমে
চোখের কাজল।"[১]

বেতার অনুষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ

১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠার দিন থেকে শুরু করে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অসংখ্য নারী বিভিন্নভাবে যেমন সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যশিল্পী, উপস্থাপিকা, ঘোষিকা, আলোচক, সংবাদ পাঠিকা, পাণ্ডুলিপিকার, গীতিকার, নাট্যকার, আবৃত্তিকার হিসেবে জড়িত ছিলেন। এর ফলে নারীরা নিজেদের প্রতিভা ও গুণ প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। সেই সাথে পেয়েছেন পরিচিতি ও আর্থিক উপার্জনের পথ।

হুসনা বানু খানম

চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে নারীরা সাধারণত সঙ্গীত শিল্পী, অভিনয় শিল্পী ও উপস্থাপিকা হিসেবে বেতারে জড়িত হন। শামীমা চৌধুরী সূত্রে জানা যায় সেকালের অনেক স্মরণীয় নাম : যেমন: লায়লা আরজুমান্দ বানু, অঞ্জলি রায়, গীতা দত্ত, নীলিমা দাস, হুসনা বানু খানম, ফরিদা ইয়াসমিন, নূরুন্নাহার, নীনা হামিদ, মাহবুবা হাসনাত (পরে রহমান) ছিলেন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বেতারের প্রধান সঙ্গীত শিল্পী।

মাহবুবা রহমান

এ সময় নাট্যশিল্পী হিসেবে যারা বেতারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, আয়েশা আখতার। তিনি প্রথম জীবনে সেতারা সাত্তার নামে অভিনয় করতেন। নূরুন্নাহার, খোরশেদী আলম, মায়া আচার্য, হোসনে আরা, আমেনা চৌধুরী, আলেয়া কবীর, লিলি চৌধুরী, খালেদা কবির আলম, সাদেকা সাইদ, লায়লা সামাদ, জহরত আরা, ডা. রওশন আরা, রহিমা খালা, রওশন জামিল, রাণী সরকার, মিনতি হোসেন, নাসিমা খান, সুমিতা দেবী, তন্দ্রা ইসলাম, নমিতা আনোয়ার, নাজনীন আহমেদ, সুজাতা, আজমেরী জামান, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, মিরানা জামান, শর্মিলী আহমেদ, ডা. ফিরোজা বেগম, মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস প্রমুখ। ১৯৩৯ থেকে পুরো পঞ্চাশের দশক জুড়ে এঁরা বেতার নাটকে অভিনয় করেছেন দাপটের সঙ্গে।

এ সময় মহিলাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে প্রচারিত হতো নানা অনুষ্ঠান। যাঁরা এই অনুষ্ঠানগুলো উপস্থাপন করতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, নূরজাহান মোর্শেদ, লুলু বিলকিস বানু, বেগম সুফিয়া কামাল, মাসুমা চৌধুরী, রাজিয়া বেগম, রোকাইয়া আনোয়ার, ডা. ফিরোজা বেগম, ড. আখতার ইমাম, ডা. রওশন আরা, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, জোবেদা খানম, মেহের কবীর, মাফরুহা চৌধুরী, জাহানারা বেগম প্রমুখ।

শিশুদের অনুষ্ঠানে খেলাঘর-এ নিয়মিত অংশ নিতেন সেলিনা বাহার (পরে জামান হন), রীনা ঘোষ, কণিকা দেবনাথ, হাসিনা ওয়াদা সহ আরও অনেকে। বেতারে অনুষ্ঠান ঘোষিকা হিসেবে, সংবাদপাঠক হিসেবে এ সময় মহিলাদের হালকা পদচারণা ঘটতে থাকে। অনুষ্ঠান ঘোষণায় সুরাইয়া জাবীন, হেনা কবীর, বেগম রাবেয়া আব্বাস, আমেনা বেগম, হাসিনা মওলা, নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা, ডা. ফিরোজা বেগম জনপ্রিয় ছিলেন।

মহিলা শিল্পীদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ছিল, এরা ছিলেন অনেকটা একের ভেতরে দুই বা বহু। যিনি নাটকে অভিনয় করতেন এঁদের কেউ কেউ গানও গাইতেন, উপস্থাপনাও করতেন। আবার প্রয়োজনে স্ক্রিপ্টও লিখতেন।

২০০৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বেতার কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত নারীর সংখ্যা : সংগীত শিল্পী ১০৮৮ জন, নাট্যশিল্পী ৩০২ জন, উপস্থাপনায় ২৯ জন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ১৫০ জন।[২]

ঢাকা বেতারের অনেক শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারেও অংশগ্রহণ করেন। যেমন- সুমিতা দেবী, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, মালা খান, সানজিদা খাতুন, শাহীন সামাদ, বুলবুল মহলানবীশ প্রমুখ।

বেতার অনুষ্ঠান প্রযোজনা, প্রশাসন ও অন্যান্য

বেতার অনুষ্ঠান নির্মাণ বা প্রযোজনায় মেধা, মনন, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সমকালীন সময়ের চাহিদা, আনুপাতিক জ্ঞান যেমন প্রয়োজন, তেমন বেতার প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও চাই মেধা, দক্ষতা ও শৃঙ্খলা। পুরুষ আধিপত্যের মধ্যেও নারীরা বেতারে এসব ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক নারী বিসিএস ক্যাডারভুক্ত হয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় রেখেছেন দক্ষতার স্বাক্ষর।

নূরজাহান মুরশিদ

ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা অনুষ্ঠান সহকারী নূরজাহান মুরশিদ। তিনি ১৯৪৭ উত্তর পরিবেশে কলকাতা বেতার থেকে ঢাকার বেতারে যোগ দেন। তিনি প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা বেতার কর্মকর্তা। তিনি লিখেছেন :

> "ঢাকা এসে আমি নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান অফিসে প্রোগ্রাম এ্যাসিসট্যান্ট পদে যোগ দিলাম। আমরা চারজন প্রোগ্রাম অ্যাসিসট্যান্ট একটি বড় ঘরে চার কোণায় চারটি টেবিলে বসতাম। যাঁরা আমার কলিগ ছিলেন তারা হলেন স্বনামধন্য সৈয়দ আলী আহসান, বর্তমান স্পীকার শামসুল হক চৌধুরী ও প্রখ্যাত উপস্থাপক নাজির আহমদ।[৩]

ঢাকা বেতারে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেন এমন অনেক নারীর নাম পাওয়া যায় শামীমা চৌধুরী সূত্রে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন :

> সাতচল্লিশের পর পঞ্চাশের দশকে মিসেস খায়ের প্রকৌশল সুপারভাইজার হিসেবে বেতারে যোগ দেন। কর্মকর্তা হিসেবে প্রথম দিলারা হাশেম, জোহরা হক, মেহেরুন্নেসা যোগ দিয়েছিলেন। পরে যোগ দেন হাসিনা রহমান ও সুফিয়া বেগম। দিলারা হাশেম পরে যোগ দেন ভয়েস অব আমেরিকায়। জোহরা খান যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হন। মেহেরুন্নেসা যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে। হাসিনা রহমান ও সুফিয়া খানম পদোন্নতি পেয়ে পরিচালক হয়েছিলেন। হাসিনা রহমান উপ-আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। দুজনেই ইন্তেকাল করেছেন। জেজে হামিদা খানম, নূর-ই-গুলশান হাবিব, বেগম ইসমত আরা, বেগম রওশন আরা চৌধুরী উর্ধ্বতন পদ থেকে অবসরে গেছেন।
>
> শামসুন্নাহার বেগম রাঙ্গামাটি বেতারের আঞ্চলিক পরিচালকের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। জোহরা খানম উপ-পরিচালক পদ থেকে অবসরে যান। ঢাকা কেন্দ্রে আঞ্চলিক পরিচালক পদ থেকে অবসরে গেছেন দিলরুবা বেগম। আঞ্চলিক পরিচালক পদে তিনিই একমাত্র মহিলা যিনি পদোন্নতি পান। পরবর্তী ব্যাচে রোখসানা সাদ (মরহুমা), ফাতেমা রহমান, রিফাত মুনিম বেতারে যোগ দেন। এর পরবর্তী ধাপে ফাতেমা বেগম, কামরুন্নাহার, মোখলেসা খাতুন, রওশন আরা কবীর, মনোয়ারা বেগম, শামীমা খান, শামসুন্নাহার বেগম, সুরাইয়া বিলকিস, রাজিয়া সুলতানা, সাজেদা খাতুন, ফাতেমা খায়রুন্নেসা, শাহানা পারভীন, দিলরুবা বেগম, জাকিয়া সুলতানা, ইয়াসমিমুল হুদা, হাসিনা বেগম, নীলুফার নাজনিন, শাম্মী আরা চৌধুরী, মেরিনা আখতার প্রমুখ মহিলা সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, সহকারী পরিচালক, অনুষ্ঠান সংগঠক অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন। বিসিএস পরীক্ষার তথ্য ক্যাডারে উত্তীর্ণ মহিলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতি প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারের অন্যান্য দফতরের মতো বেতারেও। বেতারে অনুষ্ঠান সংগঠক (পি.ও) এবং সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে অনেক মহিলা কর্মরত রয়েছেন।
>
> ঢাকা স্টেশনের বার্তা বিভাগে বেগম শাহীন ইসলাম, হালিমা আখতার, জাহানারা তালুকদার, কোহিনুর বেগম সহ মহিলা বেতার সাংবাদিকের সংখ্যা প্রায় সাতজন। প্রকৌশল শাখায় বেগম শরীফা বানু ও দিলরুবা সিদ্দিকাসহ পাঁচজন কর্মকর্তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। মহিলা কর্মচারী আছেন বেশ কয়েকজন।

বেতারে নিজস্ব মহিলা শিল্পীর সংখ্যা প্রায় ৭০ জন। এদের কেউ প্রযোজক, কেউ নাট্যশিল্পী, কেউ প্রযোজনা সহকারী, কেউ অনুষ্ঠান সহযোগী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।[৪]

সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক দিলরুবা বেগম বলেন, আমি আমার দীর্ঘ চাকুরিজীবনে বেতারের প্রায় প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার মন মানসিকতার সঙ্গে বেতারের চাকরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল বলেই অন্য পেশার দিকে হাত বাড়াইনি। মহিলাদের জন্য বেতারের চাকরি একটি চমৎকার পেশা।[৫]

ঢাকার বেতারের সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ফাতেমা রহমানের মতে বেতারের সঙ্গে বাঙালি নারীর একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। আরেক সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক কামরুন্নাহার বেতারে চাকুরির পেশাকে ভীষণভাবে উপভোগ করেন। এখানে অনেকটা পারিবারিক পরিবেশে কাজ করতে হয়। অনুষ্ঠান সংগঠক মোখলেসা খাতুন বলেন যে সব পেশার সব শিল্পী মাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের গুণ একজন নারীর অনেকটা সহজাত। কাজেই পেশা হিসেবে নারীর জন্য বেতার একটি চমৎকার মাধ্যম।[৬]

বেতার অনুষ্ঠানে নারীর প্রতিফলন

সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীর প্রতিফলন, নারীর স্বাধীনতা, অধিকার, পেশা, উন্নয়ন ও প্রগতিশীল কিনা সে ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠে কিছু বলা মুশকিল। কেননা, বেতার থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- নাটক, আলোচনা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিতে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিরাচরিত নারীর ভাবমূর্তিই তুলে ধরা হয়। যেমন সর্বংসহা জননী, ভাবী, আত্মত্যাগী প্রেমিকা-স্ত্রী, গৃহিণী ইত্যাদি।

শামীমা চৌধুরী 'বিসিডিজেশি' আয়োজিত 'বেতার ও নারী' শীর্ষক কর্মশালার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন-

> "কর্মশালায় বেতারের প্রাক্তন ও কর্মরত বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন ব্যক্তি ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট লোকজন তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁরা তাঁদের মতামত ও অভিমতে বেতার অনুষ্ঠানে নারী চরিত্রের প্রতিফলন সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন, তাতে লক্ষণীয়, নারী চরিত্রকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয় বেতারের বেশির ভাগ অনুষ্ঠানে।
> বেতারের ঢাকা স্টেশন থেকে প্রচারিত নারী বিষয়ক অনুষ্ঠান 'বহ্নিশিখা', 'অঙ্গনা', 'আপনার ঘর আপনার সংসার' অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ও ইতিবাচক দিকগুলোকে আলোকিত করা হয়। এগুলো বেতারের নিজস্ব অনুষ্ঠান। বেতারের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, ইউনেস্কোর আর্থিক সহযোগিতায় যে উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচার হয় সেখানেও 'নারী' চরিত্রের ইতিবাচক দিকগুলো প্রাধান্য পায়। এছাড়াও বেতারের জনসংখ্যা সেল, কৃষি কার্যক্রম সেল-এর নাটক, আলোচনা, বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানে 'নারী' চরিত্র উপস্থাপিত হয় জাতীয় উন্নয়নের মানদণ্ডে।

স্নেহশীলা মা, ভাবী, আত্মোৎসগকারী প্রেমিকা চরিত্রের ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নারী চরিত্র এখন উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিফলিত। বেতারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণকারী যেসব মহিলা তাদের আলোচনার বিষয় এতদিন ঘরসংসার, রান্নাঘর-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন তারাই এখন শিল্প-সাহিত্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেন।[৭]

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও নারীর বিভিন্ন অবস্থা প্রতিফলনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞাপন। ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ঢাকা বেতার হতে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞাপনে নারী সংশ্লিষ্টতার বিষয়গুলো (বিষয়বস্তু, ভাষা, উপস্থাপনা) ছিল শালীন ও ঐতিহ্যগত। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞাপনে নারীকে বিকৃতভাবে ব্যবহার শুরু হয়। ইলেকট্রনিক মাধ্যম তথা বেতারের বিজ্ঞাপনে নারীর বিকৃত ব্যবহার প্রসঙ্গে লিখেছেন অলিউর রহমান :

"গণমাধ্যমের অস্তিত্বের ঘোষক তথা রক্তসঞ্চালক' উপাদান হিসেবে বিবেচিত বিজ্ঞাপন জগতেও নারীর নিজস্ব কোন সত্তা বা পরিচিতি নেই। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নারীকে বহুভাবে সেলস প্রোমোশনাল; তথ্য-পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রায় সব ধরনের বিজ্ঞাপনে নারী বা মেয়েরাই মডেল। বিজ্ঞাপনে মেয়েদেরকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা হয় এবং নারীসৌন্দর্যকে মূলধন করে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের প্রচারে সদাব্যস্ত। গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপনগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলে এ ধারণা জন্মানো বিচিত্র নয় যে, ছেলেরা সাবান ব্যবহার করে না, চাদর ব্যবহার করে না, ক্রিম বা পাউডার ব্যবহার করে না। অর্থাৎ সব ধরনের বিজ্ঞাপনে মেয়েরাই মডেল। এমনকি সেভের বিজ্ঞাপনেও 'নারীর কোমল হাতের পরশে' পুরুষ তৃপ্ত-এই দৃশ্য প্রচার না করলে বিটিভি ও বিজ্ঞাপনদাতা ধন্য হতে পারেন না। আর লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, অধিকাংশ বিজ্ঞাপনের ভাষাই যেন বলে দেয় পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যই মূলত নারীর এতসব সাজসজ্জা এবং এর জন্য তার সুন্দরী ও আকর্ষণীয় হওয়া অতীব জরুরি।"[৮]

বেতার-শ্রোতা

শ্রুতিমাধ্যম বেতারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্রোতা। বেতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদের তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা প্রদান করে থাকে। শব্দ-কথা-সঙ্গীতের মাধ্যমে বেতার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকার মা-বোন-স্ত্রী-গৃহিনী, ছাত্রী, কাজের মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজলভ্য গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা টেলিভিশন চালুর আগে পর্যন্ত বেতারই ছিল ঢাকার রমনীদের অন্যতম আকর্ষণীয় 'যাদুর বাক্স' ও আভিজাত্যের প্রতীক। ১৯৮০ দশক থেকে ঢাকার নারীদের কাছে বেতারের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে টিভি নেটওয়ার্কের বিস্তার, ভিডিও-ডিস্ক-ক্যাসেট প্রভৃতি চালুর কারণে।

ঢাকা বেতার গণমাধ্যম ও ঢাকার নারী শ্রোতা বা ভোক্তাদের নিয়ে বৃহত্তর পর্যায়ে কোনো গবেষণা বা জরীপ প্রকাশিত হয়নি। হলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যেতো।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. লায়লা আর্জুমান্দ বানু, উদ্ধৃত, কাজী মাহমুদুর রহমান, *বাংলাদেশ বেতারের ২৫ বছর*, নিরীক্ষা, ঢাকা নভেম্বর' ৯৬-ফেব্রুয়ারী' ৯৭, পৃঃ ১৫-১৬।

২. শামীমা চৌধুরী, *বেতার গণমাধ্যমে নারী*, নিরীক্ষা, ঢাকা নভেম্বর, ২০০৩, পৃঃ ৩২-৩৩।

৩. নূরজাহান মুরশিদ, *অতীতের কথা*, নুরুননাহার ফয়জননেসা ও অন্যান্য, সম্পাদিত '*কালের সমুখ ভেলা*', ঢাকা ১৯৮৮, পৃঃ ১৫৬।

৪. শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

৫. সাক্ষাৎকার, শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৬. সাক্ষাৎকার, শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৭. সাক্ষাৎকার, শামীমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬।

৮. অলিউর রহমান, *বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারী প্রকৃতি*, নিরীক্ষা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, ঢাকা, পৃঃ ২০।

তৃতীয় অধ্যায়
টেলিভিশন

দৃশ্য এবং শ্রুতিমাধ্যম হিসেবে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ক্ষেত্র হচ্ছে টেলিভিশন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, বয়স্ক-কিশোর ইত্যাদি প্রায় সব ধরনের চক্ষুস্মান দর্শক-শ্রোতাদের খুব সহজেই টেলিভিশন আকৃষ্ট করতে পারে।

বিদেশে ১৯২৪-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে টেলিভিশন চালুর ৩৮-৪০ বছরের মধ্যেই ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর হতে চালু হয় টেলিভিশন। জাপানীদের সহায়তায় স্থাপিত সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন পরবর্তীতে ঢাকাসহ দেশের বৃহত্তর অঞ্চল এর সম্প্রচারের আওতায় আসে। একুশ শতকের প্রথম দশকে ঢাকায় ১০/১২টি বেসরকারী টেলিভিশন চালু হয়। ফলে রাজধানী ঢাকা হয়ে ওঠে টেলিভিশন সম্প্রচারেরও রাজধানী।

ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠার চারশো বছর পূর্তির প্রাক্কালে ঢাকায় টেলিভিশন চালুর ৪৬ বছর পূর্তি চলছে। এই স্বল্প সময়ের প্রেক্ষাপটে ঢাকার টেলিভিশন গণমাধ্যমের নানা ক্ষেত্রে নারী-সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অংশগ্রহণকারী, নির্মাতা-প্রযোজক-প্রশাসক ও দর্শক হিসেবে বিবেচিত হবে। ঢাকা টেলিভিশনে নারী সংশ্লিষ্টতার বিষয়টির অগ্রগামী প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে আগে থেকেই এখানে চালু সংবাদপত্র, বেতার ও চলচ্চিত্র গণমাধ্যম এবং নারীর প্রতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় টেলিভিশন চালুর পর ইলেক্টনিক মিডিয়াতে নারীর অবস্থান আশার আলো দেখায়।[১]

শুরুর সেদিন

অনেকেরই জানা নেই যে, প্রবল পুরুষ আধিপত্যের দখলে থাকা গণমাধ্যমের অন্যতম প্রভাবশালী ক্ষেত্র টেলিভিশন ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালুর আগেই একজন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নারী এর প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। তিনি কাজী মদিনা। তিনি ১৯৬৪ সালের ১১ নভেম্বর টেলিভিশনের প্রশাসন বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ওখানে ছিলেন। তিনি টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও অংশ নিতেন। প্রবল পুরুষ আধিপত্যের মাঝে থেকেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অনেকের চাকুরীর নিয়োগপত্রও তাঁর হাত দিয়েই হয়েছিল। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন–

> "..... ডিআইটি ভবনে অনুষ্ঠান হবে আর লোকে ঘরে বসে দেখবে, এ যে কি চমকপ্রদ ব্যাপার। রূপকথার গল্পের চেয়েও আকর্ষণীয়। আর সে ব্যবস্থাপনার সাথে আমি যুক্ত আছি ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে উঠতো।.... এল ২৫ ডিসেম্বর।..... আমরা অবাক

বিস্ময়ে দেখলাম হ্যাঁ, ফেরদৌসী বেগম (বর্তমানে রহমান) সেই ছোট্ট বাক্সের ভেতরে গান করছেন।[২]

ফেরদৌসী রহমান

ফেরদৌসী রহমান ছিলেন ঢাকা টিভির উদ্বোধনী দিনের প্রথম মহিলা সংগীত শিল্পী। তিনি জানিয়েছেন :

"ওই যে আকাশ নীল হল আজ
সে শুধু তোমার প্রেমে
ওই যে বাতাস বাঁশী হল আজ
সে শুধু আমার প্রেমে ॥

সোনালী পাড় সবুজ শাড়ী-গায়ে লাল চাদর পরেছি– কপালে টিপ– ডি.আই.টির ছোট্ট স্টুডিও– চারদিকে বড় বড় বাতি জ্বলছে– আমার সামনে বড় বড় দুটো ক্যামেরা– যেগুলোকে ডানে বাঁয়ে– সামনে পেছনে করা হোচ্ছে– পেছনে লাল সবুজ সাদা কাগজ পেঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে বড় বড় পাতলা চৌকানো ফ্রেমের সঙ্গে– সেট করা হয়েছে তাই দিয়ে। আমি হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে দাঁড়িয়ে– আমার জীবনে প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠানে গাইছি। ১৯৬৪ সনের ২৫শে ডিসেম্বর বিকেলে ডি.আই.টির বাইরে বিরাট সামিয়ানায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান– এদেশের প্রথম টি.ভি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। তারপর স্টুডিওতে সন্ধ্যা সাতটায় প্রথমে গানের অনুষ্ঠান– প্রথমে গাইলাম আবু হেনা মোস্তফা কামালের লেখা এবং আনোয়ার উদ্দীন খানে সুর করা ওপরের গানটি। তারপর গাইলাম একটি ভাওয়াইয়া। আমার হাতের ডানদিকে দূরে ছিল ছোট একটা টেলিভিশন মনিটর, সেটাতে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম- গানের ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে দেখছিলাম। অপর দিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চোখ ক্যামেরার দিকে রাখারই চেষ্টা করলাম, যাতে মনে হয়, আমি দর্শক শ্রোতাদের দিকে তাকিয়েই গান গাইছি। এতোদিন গাইছিলাম বেতারে– যেখানে জানি কোনো দর্শক নেই– শ্রোতাদেরও দেখিনা, সুতরাং কপালটা কোঁচকালে ক্ষতি নেই– বা গানের ফাঁকে যন্ত্রীদের ইশারা করতে কোনো অসুবিধা নেই– শুধু গানটা ভালো করে গাওয়াই আসল। ...

এই প্রথম এলো টেলিভিশন। যেখানে সমানে দর্শকও নেই, শ্রোতাও নেই। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হচ্ছে যে, দুটোই সামনে আছে। ওই ক্যামেরার পেছনে। এ এক মজার অনুভূতি।

সেদিনের সেই প্রথম অনুষ্ঠান করার অনুভূতির সাথে বোধহয় আর কোনকিছুর তুলনা হয় না। ... দু'দিন পরে– মানে ২৭শে ডিসেম্বরে করলাম– সঙ্গীত শিক্ষার আসর, ১৫ মিনিটের অনুষ্ঠান ছিল। প্রথম গান শিখিয়েছিলাম একটি নজরুলগীতি। 'বউ কথা কও, বউ কথা কও'– আমার সবচেয়ে আনন্দ যে, সে অনুষ্ঠানটি আজও চলছে– 'এসো গান শিখি' নামে।[৩]

টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

১৯৬০ দশকের মধ্যভাগে রাজধানী ঢাকায় টেলিভিশন চালু হলে মহিলাদের জন্য নানা ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন– সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য, ম্যাগাজিন, অনুষ্ঠান ঘোষণা, আলোচনা, সংবাদপাঠ, নাটক রচনা, পাণ্ডুলিপি রচনা, গান রচনা ইত্যাদি। টেলিভিশন একই সঙ্গে শ্রুতি ও দৃশ্য মাধ্যম। এর রয়েছে প্রত্যক্ষতা ও আকর্ষণীয় ক্ষমতা। তাই শিক্ষিত ও সচেতন মহিলারা ওই গণমাধ্যমে জড়িত হতে আগ্রহী হন। ঢাকা টেলিভিশনে প্রথম থেকেই সঙ্গীতে জড়িত ছিলেন ফেরদৌসী রহমান, ফাহমিদা খাতুন(প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী), সানজিদা খাতুন, রওশন আরা মাসুদ, আঞ্জুমান আরা বেগম, ফিরোজা বেগম, ফরিদা ইয়াসমিন, নীলুফার ইয়াসমীন, নীনা হামিদ, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমতউল্লাহ, রওশন আরা মোস্তাফিজ এবং পরে রুনা লায়লা, শাহীন সামাদ, শাম্মী আখতার, জিনাত রেহানা, হাসিনা মমতাজ, সাবিহা মাহবুব, লীনা তাপসী, ডালিয়া নওশীন, বেবেকা সুলতা, আবিদা সুলতানা, ফাতেমা তুজ জোহরা, ইসমত আরা, নার্গিস পারভীন, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, ফরিদা পারভীন, শবনম মুশতারীসহ দিলরুবা খান, মমতাজ, সুফিয়া মনোয়ার প্রমুখ। ২০০৯ সালে পর্যন্ত শত শত মহিলা সঙ্গীত শিল্পী জড়িত ছিলেন।

ফেরদৌসী মজুমদার

টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরীর 'একতলা-দোতলা' (১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী)। এতে অভিনয় করেন ফেরদৌসী মজুমদার।[৪] পরবর্তীতে নাট্যশিল্পী হিসেবে জড়িত হন লিলি চৌধুরী, সুমিতা, রওশন জামিল, রানী সরকার, শাহরে বানু, রেখা আহমেদ, ডলি ইব্রাহীম, রেশমা, কবরী, দিলারা, আয়েশা আখতার, মিরানা জামান, হুসনে আরা, সাবেরা মুস্তফা, মিরানা জামান, চম্পা, তারানা হালিম, আফরোজা বানু, ডলি জহুর, কেয়া চৌধুরী, লুৎফুন্নাহার লতা, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, শান্তা ইসলাম, মিতা চৌধুরী, সুবর্ণা, শমী কায়সার, বিপাশা হায়াত প্রমুখ। নাট্যকার হিসেবে তাজুন্নেসা আহমেদ, বেগম মমতাজ হোসেন, রাবেয়া খাতুন, সাদেকা শফিউল্লাহ, হাজেরা নজরুল, লাকী ইনাম দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সারা যাকের

সংবাদ পাঠিকা হিসেবে নাজমা চৌধুরী, তাহমিনা শাহাবুদ্দিন, ফারহানা হক, মুনমুন আহমেদ, ইসমাত জেরিন খান, ইয়াসমীন হক এবং আরো অনেকে পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা। অন্যদিকে নারী সংশ্লিষ্টদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলো। ইতোমধ্যেই প্রতিবেদক হিসেবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ঘটনা ও বিষয় সরাসরি টিভিতে রিপোর্টিং করে খ্যাতি পেয়েছেন মুন্নী সাহা, শাহনাজ মুন্নী, তামান্না মজুমদার, ফারজানা রূপা, নাদিরা কিরণ, সুলতানা রহমান পুতুল, মেহেরুন রুনী প্রমুখ।[৫]

ঢাকা টেলিভিশনের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় নাচ। টেলিভিশনে প্রথম নাটক পরিবেশিত হয় মন্দিরা নন্দীর পরিচালনায় তাঁর সঙ্গে নেচেছিলেন পারভীন আহমদ, নাসরীন আহমদ, আফরিন আহমদ-তিন বোন।[৬]

নৃত্যশিল্পী হিসেবে টিভিতে আরো অবদান রেখেছেন রওশন জামিল, রাহিজা খানম ঝুনু, লায়লা হাসান, কাজল ইব্রাহীম, ডলি ইকবাল, জিনাত আলী পলি, নাজমা, ডরিন জামান, সালেহা খাতুন, বীথি, আলপনা মমতাজ, শাহেদা আলতামাস, লুবনা মরিয়ম, শারমিন হাসান, অঞ্জনা, নূপুর, কান্তা জামিল প্রমুখ।[৭]

টেলিভিশন অনুষ্ঠান ঘোষণাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কলা। এ ক্ষেত্রেও নারীরা পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন শুদ্ধ, সাবলীল উচ্চারণ ও দৃষ্টিনন্দন শৈলীতে। ঢাকা টিভির

প্রথম অনুষ্ঠান ঘোষিকা ছিলেন মাসুমা খাতুন। পরে এক্ষেত্রে হেনা কবীর, মিসেস রিজিয়া, অঞ্জলি মোস্তফা, শিউলি খান প্রমুখ জড়িত হন।

সুবর্না মুস্তাফা

বেগম সুফিয়া কামাল টিভির প্রথম প্রদর্শন থেকে বহুদিন জড়িত ছিলেন। তিনি অনষ্ঠান উদ্বোধন, পরিচালনা, আলোচনা, আবৃত্তি করতেন।[৮] সালমা খান টিভির একজন অগ্রগামী শিল্পী ও মহিলা অনুষ্ঠান পরিচালক। তিনি ১৯৬৫ সালের ২০ জানুয়ারী হতে 'স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে সাধারণ জ্ঞান ও প্রতিযোগিতামূলক কুইজ প্রোগ্রাম করেন। পরে তিনি মহিলাদের জন্য প্রথম অনুষ্ঠান পরিচালনা শুরু করেন। এই অনুষ্ঠানে ঘর সাজানো সহ মহিলাদের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হতো।[৯] পরবর্তীকালে আরো যাঁরা মহিলাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীলিমা ইব্রাহীম, জেবুন্নেসা জামাল, বেগম নূরজাহান, সুফিয়া আহমদ, রাবেয়া ভূঁইয়া, আজরা আলী, রাশিদা জামান, জাহানারা ইমাম, সাদেকা সফিউল্লাহ, মকবুলা মঞ্জুর, রিজিয়া রহমান, সাঈদা খানম, আমেনা মাহমুদ, আলেয়া ফেরদৌসী, জাহানারা বেগম, সেলিনা হোসেন, জোবেদা খানম, জোবায়দা গুলশান আরা প্রমুখ।[১০]

টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযোজনা, পরিচালনা, প্রশাসন ও অন্যান্য

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র নারীদের জন্য পেশাগতভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণ, প্রযোজনা, প্রশাসন, প্রকৌশল, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, আলোক নিয়ন্ত্রণ, শিল্প নির্দেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৬৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলেও অনেক নারী দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ঢাকা টিভির অগ্রণী নারী প্রযোজক ছিলেন খালেদা ফাহমী। ১৯৬৬ সালের মে মাসে তিনি টিভিতে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন :

> "আমার সামনে উন্মোচিত হলো শব্দ এবং দৃশ্যের এক নতুন জগত। দূর থেকে যা ছিল আমার কাছে এক ভীতিকর বিস্ময়, কাছে এসে দেখলাম, সৃষ্টির আনন্দ এবং বেদনামাখা সে এক নতুন পরিমন্ডল। ভালো লাগলো নতুন মাধ্যমের পেছনে কান্ডারী হিসেবে হাল ধরে থাকা সৃষ্টিশীল গুণী মানুষগুলোকে।"[১১]

পরবর্তীতে তিনি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিচালক ও মহাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। প্রযোজক ও অনুষ্ঠান পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সাকিনা সারোয়ার, বদরুননেসা আব্দুল্লাহ, কামরুন্নেসা হাসান, শাহীদা আরবী, শাহীদা আলম, লায়লা হকসহ আরো অনেক নারী। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রযোজনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, মহিলাদের অনুষ্ঠান, শিশুদের অনুষ্ঠান, বার্তা বিভাগে কাজ করেছেন। টিভিতে প্রথম নারী কর্মকর্তা হিসেবে প্রশাসনে যোগ দেন কাজী মদিনা। পরে রওশন আরা ও আনিসা বেগম।

নিয়মিত চাকুরীজীবী ছাড়াও ১৯৯৬ সাল থেকে প্যাকেজ অনুষ্ঠানের আওতায় অনেক নারী নির্মাতা নাটকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। অনেক নারী আলোক চিত্র গ্রাহক, সম্পাদক, আলোক নিয়ন্ত্রক, শিল্প নির্দেশক হিসেবেও কাজ করেছেন।

বেসরকারী টিভি চ্যানেল (একুশে, এটিএন, চ্যানেল আই, বাংলা ভিশন, এনটিভি, আরটিভি প্রভৃতি) গুলোতেও অনেক নারী অনুষ্ঠান নির্মাণ, পরিকল্পনা, প্রযোজনা, প্রশাসন, আলোকচিত্র গ্রহণ, সমন্বয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে মেধার পরিচয় দিয়েছেন।

টেলিভিশনে নারীর প্রতিফলন

গণমাধ্যম টেলিভিশনের নারীর রূপায়ন বা প্রতিফলন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন বিষয়বস্তু (নাটক, সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারীর প্রতিফলন), মহিলাদের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপন।

টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে নাটক (খন্ড, একক ও সিরিজ) অত্যন্ত জনপ্রিয়। সরকারী নিয়ন্ত্রিত টিভির নাটকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নারী চরিত্রগুলোর নির্মাণ ও বৈশিষ্ট্যে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে ঐতিহ্যগত পারিবারিক, রোমান্টিক, আদর্শিক ভাবধারাই প্রতিফলিত। স্বামী, সন্তান, সংসার, রূপ, সৌন্দর্য, প্রেম, বিয়ে, স্নেহ, ত্যাগ, মমতা, মাতৃত্ব এসব চরিত্রগুলোতে তুলে ধরা হয়। নারীর যে অন্যান্য চরিত্র বা রূপও থাকতে পারে (প্রশাসক, সৈনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, বিচারক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি) তা নাটকে তুলে ধরা হয় না। বিভিন্ন নাটকে নারীবিরোধী ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে। নাটকে নারীকে দেখানো হচ্ছে 'মেয়ে মানুষ' হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। আর মহিমান্বিত করা হচ্ছে মাতৃত্বকে।

আলী রিয়াজ 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারীর প্রতিমা' শীর্ষক এক গবেষনায় ১৯৬৬-১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঢাকা টিভিকেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে নারীদের রন্ধনশালা, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহ ব্যবস্থাপনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 'সকাল-সন্ধ্যা', 'এইসব দিনরাত্রি, 'প্রতিশ্রুতি' নাটকে নারীকে গৃহবন্দী, পরনির্ভরশীল, সবংসহা করে রাখা হয়েছে। এইসব নাটকে নারীর মর্যাদা নেই।[১২]

মেঘনাগুহ ঠাকুরতার পর্যবেক্ষণ এই যে, টেলিভিশন ও রেডিওর উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের অবদান উপেক্ষা করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা ভিত্তিক অনুষ্ঠানে নারীর মুখ্য লক্ষ্য হয়ে ওঠে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিশু লালন-পালন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'উজ্জীবন'-এ সামাজিক এবং ধর্মীয় আচরণ মান্যসহ স্বামী কর্তৃক নির্যাতনের বিষয় কোরানের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়।[১৩]

সুরাইয়া খানম টিভিতে প্রচারিত ১৯৮৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের নাটক, গল্প থেকে নাটক এবং ধারাবাহিক নাটক পর্যালোচনায় দেখিয়েছেন যে, নারীরা পুরুষের সামগ্রী রমণীয় ও যৌন বিষয় এবং মাতৃত্বের সুষমামন্ডিত। তারা সর্বংসহা, স্বামীর নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা তবে প্রণয়াকাঙ্খী, যৌনাবেদনময়ী, পরনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাহীন।[১৪]

টেলিভিশন সংবাদেও নারীকে দেখানো হয় 'সুন্দরী' হিসেবে পত্রিকায় প্রকাশিত আকর্ষণীয় ছবির মতোই। আলোচনা সভা, সেমিনার, পরীক্ষা কেন্দ্র, পুষ্প প্রদর্শনী, ঈদের বাজার, উদ্বোধন অনুষ্ঠান, সঙ্গীত-নাটক-নাচের দৃশ্যে এমনকি শোকার্ত অবস্থায়ও ক্যামেরার কারসাজিতে ক্লোজআপে নারীকে অশ্লীলভাবে দেখানো হয়।

বিটিভিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়ে থাকে। টেলিভিশন শুরুর সময় থেকে সপ্তাহে একটি করে মহিলাদের অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। এছাড়া 'শুভেচ্ছা' নামক একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানও প্রচারিত হতো। এতে মহিলাদের নানা লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করা হতো। 'সংসার' নামেও একটি মহিলা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো।[১৫] এসব অনুষ্ঠানে নারীর গতানুগতিক রূপই তুলে ধরা হয়।

টেলিভিশনে নারীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে বিজ্ঞাপন। এটা জানা কথা যে, বিজ্ঞাপন নারীকে একই সঙ্গে ভোক্তা ও পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। অন্যদিকে উদ্যোক্তারা নারীর দেহকে ব্যবহার করে পণ্যের পরিচিতিও কাটতির জন্য।

মুশতাক আহমেদ 'বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাইম-টাইম বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, নারী গৃহকর্মী, মমতাময়ী মা, পেশাহীন, পুরুষ নির্ভর, সৌন্দর্য সামগ্রী, পুরুষ সান্নিধ্য প্রয়াসী, নির্বোধ, যৌনবস্তু, প্রসাধনপ্রিয়, কলহপ্রিয়, স্ত্রী, অনুপ্রেরণাদাত্রী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল, জন্মশাসনের ভোক্তা, গৌনকার্যের কর্মী, অনুগত, লজ্জাবতী, পুরুষ ও সংসারসেবী এবং পুরুষের পরামর্শগ্রহণকারী।[১৬]

টিভি বিজ্ঞাপনে নারীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের আরো একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন সৌরভ সিকদার। তিনি ২০০৬ সালের আগষ্ট মাসে বিটিভি, এটিএন বাংলা ও বাংলাভিশনের ১৩১টি বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেভাবে নারীকে দেখা হয় সেই নারীর চিরাচরিত প্রতিরূপই বিজ্ঞাপনে প্রতিফলিত।[১৭]

টেলিভিশনের ভোক্তা-দর্শক

গণমাধ্যমের মূল্য লক্ষ হচ্ছে ভোক্তা পাঠক-শ্রোতা-দর্শক। জনপ্রিয় গণমাধ্যম টেলিভিশনের ভোক্তা হচ্ছে দর্শক-শ্রোতা। ঢাকা তথা সারা বাংলাদেশে টেলিভিশন ১৯৬৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোটি কোটি দর্শক তৈরি করেছে। এই দর্শকদের অধেকেই

নারী। 'ঘরোয়া বিনোদন' মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন নারী দর্শকদের অবসরের সাথী এবং অবলম্বন। টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন নাটক, সঙ্গীত, ম্যাগাজিন, মহিলাঙ্গন তাদের প্রিয় বা অপ্রিয় হয়েছে, বিজ্ঞাপন তাদের প্রভাবিত করেছে, সংবাদ দেখে তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নারী দর্শকরা টিভি তারকাও তৈরি করেছে।

তবে দুর্ভাগ্য যে, টেলিভিশনের দর্শক হিসেবে কখনোই নারীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। তারা রয়ে গেছেন উপেক্ষিত এবং পর্দার অন্তরালেই। অদ্যাবধি নারী দর্শকদের নিয়ে সুসংহত কোনো প্রকাশিত গবেষণাকর্ম বা জরীপ পাওয়া যায়নি পত্র-পত্রিকায় মাঝে-মধ্যে হালকা মন্তব্য বা চিঠিপত্র ছাড়া। এখন টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে প্রেক্ষালয় তৈরি হয়েছে। সেই সাথে তৈরি হয়েছে ঘরোয়া বা পারিবারিক বিনোদন সংস্কৃতি। গৃহিণী থেকে শুরু করে কাজের মেয়ে সবাই একসঙ্গে বসে টিভি দেখে বিনোদিত এবং প্রভাবিত হয়। কোটি কোটি নারী দর্শক-ভোক্তারাই গণমাধ্যমের শক্তিশালী ক্ষেত্র টেলিভিশনের বিস্তার ও প্রসারে 'অদেখা শক্তি' হিসেবে অবদান রেখেছেন। সময়ের স্বল্পতা ও অন্যান্য কারণে বিপুল সংখ্যক এই নারী দর্শকদের অভিমত জানা সম্ভব হয়নি। টেলিভিশনের আদি ও নিবেদিত দর্শকদের মধ্যে একজন কবি সুফিয়া কামাল। তিনি লিখেছেন :

> "....টেলিভিশনের অবদান আমাদের সময়ে যথেষ্ট সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প প্রচার সহায়ক হয়েছে। সেই সময়ে আইয়ুব খানের কড়া শাসনের মধ্যে ও ভাষার প্রবণ বিরোধিতার মধ্যে টেলিভিশন মাধ্যমে বাংলা ভাষার ও শিল্প সাহিত্য, কাব্য, নাটকের বহুল প্রচার হয়েছে। একাত্তরের পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করতেও টেলিভিশনের সাহায় আমরা পেয়েছি। একাত্তরে যখন ঢাকা পাকিস্তানীদের অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য, তখন দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশত অনেক ঘটনা দূর্ঘটনার সংবাদ টেলিভিশনে প্রচার করতে হয়েছে। সেকথা কখনও ভুলব না। অধ্যাপক নূরউল্লার গৃহীত সেই ভয়াবহ হত্যাকান্ডের গোপনে তোলা চিত্র আমাকেই উদ্বোধন করতে দেখাতে হয়েছে। শহীদ বুদ্ধিজীবিদের নিখোঁজ সংবাদ স্বজন হারানো ব্যথা বুকে নিয়ে আমাকেই উচ্চারণ করতে হয়েছে। বিজয় দিবসের প্রথম প্রচার আনন্দ উভোগ করার অবসর নাহলেও পরাজিত পাকিস্তানী সেনাদের এলোপাথারি গুলি চালানোয় পথচারীদের রক্ত রাঙ্গা কাপড়েই আমাকে যেতে হয়েছে টেলিভিশনে বিজয় বার্তা প্রচার করতে..... টেলিভিশনে আমরা দেখেছি দুইটি সার্থক নাটক 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'এইসব দিন রাত্রি' ও মোমতাজউদ্দীন আর আবদুল্লাহ আল মামুনের সার্থক সমাজ ও জনজীবনের চিত্র খন্ড নাটক। আর দেখেছি আবদুল্লাহ আবু সাঈদের টেলিভিশন ম্যাগাজিন। দেখেছি ফজলে লোহানীর 'যদি কিছু মনে না করেন'। এসব অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে সারাজীবন।
>
> তবে কিছু কথা বলি বর্তমানে নাটক, নৃত্য, সঙ্গীত ও বিজ্ঞাপনে বড় বেশী অশোভন দৃশ্য দেখা যায়। মহিলাদের নাটক চরিত্রে দুর্মুখ অতি আধুনিকা এবং দেশ সমাজ বিরোধী বলে প্রচার করাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে মেয়েদের শালীনতা নষ্ট হয় এবং অমর্যাদা করা হয় বলে খুব দুঃখ বোধ হয়। গ্রাম্য কিশোরী চরিত্রে গ্রামের মেয়েরা এত সাজগোজ বা মাথায় কাপড় না দিয়ে মাঠে ঘাটে চলা ফেরা করে না। অত গান গেয়ে বেড়ায় না এসবের দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি। অশালীন কাপড় পরা অশোভন বিজ্ঞাপন বড় দৃষ্টিকটূ হয়। আরও অনেক কিছুর দিকে কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি

দিয়ে টেলিভিশনকে যুব ও শিশু সমাজকে সু-সাহিত্য, শোভন সংস্কৃতি ও সত্য প্রকাশের সুযোগ দান করবেন বলে অনুরোধ করি। শিশু কিশোরদের অনুষ্ঠানমালায় বসন ভূষণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় না করে সহজ স্বাভাবিক অভিনয় স্বচ্ছন্দ নৃত্যগীতিতে অভ্যস্ত করানো বড় প্রয়োজন। সেদিনই দেখলাম বড় গৌরবের বহুল প্রচারিত এবং প্রশংসিত পল্লী কবি জসিমউদ্দীনের নকশী কাঁথার মাঠ, অভিনীত হল, এটা কি ব্যালে না অন্য কিছু? কোথায় সেই পল্লী বালিকা। কোথায় সেই পল্লী কিশোর – কি বসন কি চাল চলন। কবি আজ বেঁচে থাকলে এ অবস্থা দেখে হয়তো ক্ষেপে যেতেন....।[১৮]

সালমা খান ঢাকায় আমদানীকৃত প্রথম ব্যাচের সাদাকালো একটি টিভি সেট সংগ্রহ করেছিলেন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি উত্তেজনাপূর্ণ, বিস্ময় ও অধীর আগ্রহে দেখেছিলেন ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরের ১৫ মিনিটের অনুষ্ঠান। ওই সময় অনুষ্ঠান চলতো সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং সোমবার বাদে সপ্তাহে ৬ দিন। পরে তিনি টিভি অনুষ্ঠান পরিচালনায়ও জড়িত হন।[১৯]

সিতারা মুসা ও জাহানারা ইমাম টেলিভিশন অনুষ্ঠান সমালোচক হিসেবে খ্যাত। তাঁরা দু'জনই টেলিভিশনের সিরিয়াস দর্শকও। সিতারা মুসা দৈনিক 'পূর্বদেশ' আর জাহানারা ইমাম সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় টিভি সমালোচনা লিখতেন।

টেলিভিশনের সেই সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নারী দর্শক সৃষ্টি হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক যে, টেলিভিশন দর্শক হিসেবে তাঁরা উপেক্ষিত, অজ্ঞাত এবং অনুল্লেখিতই রয়ে গেছেন। তাঁদের অভিমত নিয়ে গবেষণা বা জরীপ হলে এই ঘরোয়া প্রেক্ষাগৃহ সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতো।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. শামীমা চৌধুরী, *সংবাদ মাধ্যমে নারী পথচলায় বাধা কোথায়*, নিরীক্ষা, ঢাকা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃ: ১০।

২. কাজী মদিনা, *মনে পড়ে আজ*, কেরামত মওলা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ: ২১৬, ২১৭।

৩. ফেরদৌসী রহমান, *টিভিতে আমার প্রথম অনুষ্ঠান*, কেরামত মওলা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ: ৮২-৮৩।

৪. ফেরদৌসী মজুমদার, *একতলা-দোতলা থেকে পাথর সময়: আমার টিভি নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১-৯৩।

৫. শান্তা মারিয়া, *সাংবাদিকতায় বাংলাদেশের নারী*, নিরীক্ষা, ঢাকা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃ:১৪।

৬. সনজিদা খাতুন, *অতীত দিনের স্মৃতি*, কেরামত মওলা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ:৪১।

৭. বরকতউল্লাহ, *বাংলাদেশ টেলিভিশনের নৃত্যানুষ্ঠান ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩-১৪৫।

৮. সুফিয়া কামাল, *টেলিভিশনের ২৫ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮-১৯।

৯. সালমা খান, *সে যুগের টিভি*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৭-৬৯।

১০. বদরুননেসা আব্দুল্লাহ, *মহিলাদের অনুষ্ঠান*, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৭।

১১. খালেদা ফাহমী, *একদিন আমিও ছিলাম*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬।

১২. আলী রিয়াজ, *রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারীর প্রতিমা*, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত *গণমাধ্যম ও নারী*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ২১-২৩।

১৩. মেঘনা গুহঠাকুরতা, *বাংলাদেশের গণমাধ্যম নিরীক্ষণে লিঙ্গীয় বিশ্লেষণ*, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১৪।

১৪. সুরাইয়া বেগম, *বাংলাদেশ টেলিভিশন নাটকে নারীর ইমেজ*, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৫. বদরুননেসা আব্দুল্লাহ, কেরামত মাওলা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, পৃঃ ১৫৭।

১৬. মুশতাক আহমেদ, *বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাইম-টাইম বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ন*; গীতিআরা নাসরীন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩-১৯০।

১৭. সৌরভ শিকদার, *টিভি বিজ্ঞাপনে নারীর প্রতিচিত্র*, নিরীক্ষা, ঢাকা, মার্চ-এপ্রিল, ২০০৮, পৃঃ ২১-২৫।

১৮. সুফিয়া কামাল, কেরামত মাওলা ও অন্যান্য সম্পাদিত *বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর*, পৃঃ ১৮-১৯।

১৯. সালমা খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২, ৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়
চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রকে বলা হয় বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার। এটি প্রযুক্তি নির্ভর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। এটি একাধারে তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা ও আকর্ষণীয় প্রচার এবং প্রভাবশালী মাধ্যম। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার চারশো বছরের (১৬১০-২০১০) ইতিহাসের শিল্প-সংস্কৃতি-বিনোদন ও গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে ১১১ বছর (১৮৯৮-২০০৯) জুড়ে রয়েছে চলচ্চিত্র। এ সময়ের মধ্যে ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বিকাশ, উন্নয়ন, সামাজিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণে রয়েছে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কখনো পর্দায় সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে, কখনো বা নেপথ্যে থেকে।

বৃটিশ উপনিবেশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশের সুদূর মফঃস্বল শহর ঢাকায় প্রথম বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অষ্টম আবিষ্কার সিনেমাটোগ্রাফ বা বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্র[১] প্রদর্শিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল[২] সদর ঘাট এলাকায় পটুয়াটুলির 'ক্রাউন থিয়েটারে'[৩]। এর আগে উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম চলচ্চিত্র দেখানো হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জুলাই মুম্বাইর ওয়াটসন হোটেলে[৪]। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী কলকাতার থিয়েটার রয়ালে এবং ১৯ জানুয়ারী ডালহোসি ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র দেখানো হয়[৫]।

পৃথিবীর বহুদেশের বহুবিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনায় চলচ্চিত্র আবিষ্কার পূর্ণতা পায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর। যান্ত্রিক কৌশলে ক্যামেরায় ধারণকৃত যে চলমান চিত্রমালা ও পরবর্তীতে ধ্বনিপুঞ্জ সুবিন্যস্ত হয়ে পর্দা বা দেয়ালে প্রক্ষিপ্ত বা প্রদর্শিত হয়ে দর্শক বা ভোক্তা হৃদয়ে অর্থ বা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তাকে চলচ্চিত্র বলা হয়। জনজীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এই মাধ্যমটি প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে প্রদর্শন, পরিবেশনা, প্রযোজনা, নির্মাণ, উপভোগ, পৃষ্ঠপোষকতা পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি রয়েছে নারীদের অবদান।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার মতো ঢাকার নারী সমাজও ছিল অন্তপুর বাসিনী। ঢাকায় চলচ্চিত্রের আবির্ভাবকালে নারীরা ছিল ঘেরাটোপে বন্দী দর্শক। ১৯৫০-৬০ দশকে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলে নারীরা অভিনয় ও সঙ্গীতে নেপথ্যকণ্ঠ দানে অংশ নেয়। পরবর্তীতে নারীরা চিত্র প্রযোজনা, পরিচালনা, সঙ্গীত পরিচালনায় অংশ নেয়ার পাশাপাশি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা, সমালোচনা, সংসদ, চর্চা এবং প্রশাসনেও জড়িত হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ঢাকার চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র ও নারী : দেশে দেশে

এটা স্বীকার করতে হবে যে, চলচ্চিত্র আবিষ্কারের ইতিহাসে নারীর কোন অবদান নেই। চলচ্চিত্রের মূল বাহন 'ক্যামেরা' শব্দটির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা পুরুষ আধিপত্যের প্রতীক হিসেবে 'ম্যান' সংযুক্ত করে ক্যামেরাম্যান চালু করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও নারী বিহীন চলচ্চিত্র অকল্পনীয়। নারীরা পুরুষ কর্তৃক চলচ্চিত্রে 'উপস্থাপিত' হয়েছে বাস্তবতার নিরিখে, বিষয়বস্তুর আঙ্গিক সূত্রে, ব্যবসায়িক কারণে।

প্রথম বাঙালি মুসলিম অভিনেত্রী : রোকেয়া খাতুন

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক নির্মিত প্রথমদিককার চলচ্চিত্রের দৃশ্যে নারীকে দেখা যায় কখনো 'মা' হিসেবে শিশুকে খাবার খাওয়াতে কখনো সৈনিকের সঙ্গে। টমাস আলভা এডিশন কর্তৃক নির্মিত ২০ সেকেন্ডের *দি কিস* (১৮৯৬) চিত্রে একজন নারীকে দেখা যায় পুরুষ কর্তৃক চুমু খেতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত কাহিনীচিত্র *দি লাইফ অব এ্যান আমেরিকান ফায়ারম্যান*-এ (১৯০৩) দেখা যায় অগ্নি-প্রজ্জলিত এক ঘরে আটকে পড়া মা ও শিশুকে। আরেকটি চিত্র *দি গ্রেট রবারি* (১৯০৪)তে কয়েকজন নারীকে দেখা যায় ডাকাতদের নিষ্ঠুরতার ভয়ে শঙ্কিত ও আর্ত চিৎকৃত অবস্থায়।

পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীরা নানা চরিত্রে নানাভাবে চলচ্চিত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। তবে এসব অভিনয় প্রায় ক্ষেত্রেই পুরুষের কামজ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপিত। হলিউডের চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রাথমিক পর্বে খ্যাতি পেয়েছেন লিলিয়ান গিস, মেরী পিকফোর্ড, ডরোথি পার্কার, সারা বারনহার্ট প্রমুখ।

ভারতীয় উপমহাদেশেও বিশশতকের প্রথম থেকে মুম্বাই ও কলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরুরকালে অনেক নারী অভিনয়ে জড়িত হন। এদের মধ্যে মুম্বাইর সকিনা, জুবায়েদা, কলকাতার কুসুমকুমারী, গহর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র পরিচালনা বা নির্মাণেও নারীরা এগিয়ে আসে। ইতিহাসে প্রথম যে নারী চিত্র নির্মাতারা নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন ফ্রান্সের এলিস গাই ব্ল্যাশ (মৃত্যু ১৯৬৮)। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি La Fee aux choux নামে ছবি পরিচালনা করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। হলিউডে লোয়া ওয়েবার, ক্লিও মেডিসন, ডরোথি আর্জনার, ইতালিতে এলভিয়া নোটারি, অস্ট্রিয়াতে লুই ভেলাটি, ফ্রান্সে জারমেন দুলাক চিত্র পরিচালনার খ্যাতি অর্জন করেন[৬]।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনাপর্বে ফাতেমা (মুম্বাই) ও প্রতিভা শাসমল (কলকাতা) এবং পরবর্তীতে অপর্ণা সেন, দীপা মেহতা, মীরা নায়ার, ইরানের তাহমিনা মিলানি, রোখসানা বনি ইতেমাত, সামিয়া মাখমাল বাফ প্রমুখ নারী চিত্র নির্মাণ করে সুনাম অর্জন করেন[৭]। তৎকালীন পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে ধর্মীয় ও সামাজিক বৃত্ত ভেঙ্গে এবং পুরুষ শাসিত চিত্রজগতে *বিন্দু থেকে বৃত্ত* নির্মাণ করে মহিলা পরিচালক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন রেবেকা।

নারী নির্মাতা সম্পর্কে শামীম আখতার লিখেছেন :

> 'একজন নারীর সমাজে তার প্রজনন সক্ষমতা, যৌনতা নিয়ে বিবেচিত। তার সামাজিক ভূমিকা তার ব্যক্তিস্বত্ত্বাকে নয়, শরীর সত্ত্বাকে গুরুত্ব দেয়। এই বাস্তবতা থেকে যে সংস্কারের উদ্ভব সেই সংস্কারকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছেন সচেতন নারী নির্মাতা এবং নারীবাদী চলচ্চিত্রকারেরা'[৮]।

ঢাকার সংস্কৃতি ও বিনোদনে নারী

ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো শহর ঢাকার নারীরাও ছিল অবরুদ্ধ। তবে উনিশ শতকের কতিপয় সামাজিক সংস্কার কর্মসূচি, ইংরেজদের প্রভাব, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নারীকে বহির্মুখী, কর্মমুখী এবং স্বাবলম্বী করে তোলে। ফলে অনেক নারী সাহিত্যচর্চা, নাটকে অভিনয়, গ্রামোফোন রেকর্ড ও বেতারে অংশগ্রহণ এবং চলচ্চিত্রে জড়িত হওয়ার সুযোগ পায়। তবে এর আগেও ঢাকার নারীদের একটি অংশ সংস্কৃতি ও বিনোদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা ও নামে জড়িত ছিল। যেমন ঢাকায় বাঈজীদের নাচ-গান চালু হয় মুঘল আমলে। সুবেদার ইসলাম খানের দরবারে যারা নাচতো গাইতো তাদেরকে 'কাঞ্চনী' বলা হতো[৯]। উনিশ শতকে ঢাকার নওয়াব, জমিদার, ধনী পরিবারে বাঈজীদের নাচ-গান ছিল আভিজ্যাত্যের অংশ। নওয়াব আব্দুল গণির (১৮১৩-১৮৯৬) দরবারে যারা নাচ-গান করতো তাদেরকে মাসোহারা দেয়া হতো। তারা আসতো আগ্রা, লাখনৌ, পাটনা, বেনারস ও কলকাতা হতে। সেকালের নামকরা বাঈজীদের মধ্যে ছিল সুপনজান, এলাহীজান, আচ্ছন বাঈ, আবেদী বাঈ, মুসতারী, গহরজান, আমিরজান, মালকাজান[১০]।

অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকার মঞ্চনাটকে কলকাতা এবং ঢাকার মহিলাদের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে রক্ষণশীলদের মধ্যে বিতর্কও চলে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে আগত হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে 'বেশ্যা'দের অংশ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়[১১]।

আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন নামে ঢাকার তিনবোন নাচ-গানের পাশাপাশি মঞ্চনাটকেও কাজ করতেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে তারা 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে 'ইন্দ্রসভা' এবং পরে 'যাদুনগর' নাটক মঞ্চায়ন করে। তাদের বিরুদ্ধেও কথা উঠে[১২]। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ক্রাউন থিয়েটারে মঞ্চস্থ 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে দুনিয়া নামে একজন স্থানীয় অভিনেত্রীকে নামানো হয়। বিশ শতকের প্রারম্ভে ঢাকার মঞ্চ নাটকে রানী, বিদ্যুৎময়ী, করুণা, পান্নাদাসী, কনক, সরোজিনী, সরলা অভিনয় করতেন।

পরবর্তীতে ১৯৪৭ উত্তর পরিবেশে রাজধানী ঢাকায় নাট্যচর্চা শুরু হয় সংস্কারমুক্ত শিক্ষিত মহিলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে শিরিন চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সিতারা সাত্তার, মরিয়ম খন্দকার, নূরজাহান মোরশেদ, হালিমা হোসেন, মিনা হোসেন, রাজিয়া খান, সুরাইয়া, টলি রায় পালধি, লায়লা সামাদ, হোসনে আরা, আখতারী বেগম, অরুণ প্রভা, রোকেয়া কবীর, নুরুন্নাহার, মমতাজ লিলি খান, মনিমুন্নেসা, সাবেরা খাতুন, গীতা দত্ত, জহরত আরা, বিলকিস বারী, মেহেরুন্নেসা, কমর আখতার, শেলী রায়, কামরুন্নাহার লায়লী, মাসুদা চৌধুরী, লায়লা নূর প্রমুখ মহিলা ঢাকার বিভিন্ন মঞ্চ নাটকে অভিনয় করে প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার পরিচয় দেন এবং আধুনিক নাট্যচর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে পরবর্তীকালে জহরত আরা ও বিলকিস বারী ঢাকার প্রথম সবাক বাংলা কাহিনী চিত্র '*মুখ ও মুখোশ*' (১৯৫৬) এ অভিনয় করেন[১৩]।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে সঙ্গীত, নাটক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ঢাকা বেতারের প্রথম মহিলা শিল্পী ছিলেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু ও অঞ্জলী রায়। অন্যদিকে কলকাতা কেন্দ্রিক গ্রামোফোন কোম্পানীতে ঢাকার মেয়েরা রেকর্ডে কণ্ঠ দান করেন। এদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন প্রতিভা বসু (রানু সোম)[১৪]।

ঢাকার চলচ্চিত্র ও নারী : আদিপর্ব

ঢাকার চলচ্চিত্র ও নারী প্রসঙ্গে অবতারণা কালে নারীকে পাওয়া যায় দর্শক হিসেবে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এবং পরে তাদের পাওয়া যায় অভিনেত্রী ও গায়িকা হিসেবে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরুর পর। মাঝখানে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় নির্মিত চিত্র 'দি লাস্ট কিস'(নির্বাক) ছবিতেও কয়েকজন নারীকে অভিনেত্রী হিসেবে পাওয়া যায়।

ঢাকায় যখন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ১৭ এপ্রিল পটুয়াটুলির ক্রাউন থিয়েটারে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় তখন তাতে অন্যান্যের সঙ্গে নারী সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দৃশ্যও ছিল। যেমন : (১) শ্রীমতি ভারতেশ্বরীর (ইংল্যাণ্ডের মহারানী) ডায়মণ্ড জুবিলী মিছিল; (২) তুর্কী সেনা কর্তৃক গ্রীক রমনী নির্যাতন; (৩) ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় তুষারপাতের মধ্যে মেম সাহেবদের বরফ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি ছোড়াছুড়ি ও (৪) কুমারী ডিয়নের ৩০০ ফুট উঁচু হতে পানিতে লাফ দেয়া।

সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ সংখ্যায় আলোচ্য প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। ওই প্রদর্শনীর প্রবেশমূল্য ছিল 'শ্রেণীভেদে আট আনা হইতে তিন টাকা মাত্র'[১৫]। ঢাকার এই প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনীতে কোনো নারী দর্শক উপস্থিত ছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ক্রাউন থিয়েটারের প্রদর্শনীর পর ঢাকার নওয়াব আহসানুল্লাহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আহসান মঞ্জিল প্যালেসে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন[১৬]। ওই প্রদর্শনীতে নওয়াব পরিবারের মহিলা দর্শকরা উপস্থিত থাকা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আদিপর্বে নারী দর্শকদের জন্য আলাদাভাবে আসন ও টিকেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল বলে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ মিলনায়তনে ১২ মে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। এই উপলক্ষে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

> 'অভিনব অভাবনীয় ব্যাপার!
> ১২ মে, ২৯ বৈশাখ সোমবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময়
> এই খানে এই নতুন! এই খানে এই নতুন।।
> জগন্নাথ কলেজ গৃহে বায়োস্কোপ
> জীবন্ত চিত্র! জীবন্ত চিত্র!! জীবন্ত চিত্র !!!
> পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিত হস্তে পরিচালিত
> প্রবেশ মূল্য:
> প্রথম শ্রেণী : ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী : ৮ আনা, তৃতীয় শ্রেণী : ৪ আনা, চতুর্থ শ্রেণী : ৩ আনা
> স্ত্রীলোকের গ্যালারি টিকেট আট আনা দেখিয়া যাইবেন, নচেৎ আক্ষেপ করিবেন'[১৭]।

পরবর্তীকালে ঢাকায় নিয়মিতভাবে সিনেমা হল পিকচার হাউজ (১৯১৩-১৪), রূপমহল (১৯২৪), লায়ন (১৯২৭), মুকুল (১৯২৯), তাজমহল (১৯২৯), প্যারাডাইস (১৯৩৯), মায়া, নাগরমহল, মানসী, বৃটানিয়া, গুলিস্তান চালু হলে নারী দর্শকরা বেশি সংখ্যায় চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে অনেক শিক্ষিত সচেতন নারী দর্শকদের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় সেকালের চলচ্চিত্রের বিবরণ।

চলচ্চিত্রে নারী : অভিনয় ও উপস্থাপনা

অভিনয়ে পথ বেঁধে দিল যারা

ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীদের অভিনয় ও উপস্থাপনা বর্ণনার আগে সমকালীন পটভূমি হিসেবে কলকাতার রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রে অভিনেত্রীদের আগমন সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে জানা যায় দেবীপ্রসাদ ঘোষের লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন :

> অভিনেত্রীহীন চলচ্চিত্রকে এক ডানাওয়ালা পাখি বলে মনে হয়। গোড়ার দিকে চলচ্চিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভূমিকা ছিল না। কাহিনী বিস্তারের সঙ্গে অভিনেত্রীদের প্রয়োজন হয়েছিল সমাজ গড়নের সূত্র মেনে। .....রঙ্গালয় শুরুর সময়

অভিনেত্রীদের কাজ পুরুষরা বেশ-বদল করে চালিয়ে নিতেন। তিনি (মাইকেল মধুসুদন দত্ত) 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৭০) নাটকে নারী চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তখনকার চলতিধারার বিরুদ্ধে তাঁর মত ছিল, অভিনেতারা কখনও অভিনেত্রীদের স্থান পূরণ করতে পারে না। তাই চরিত্র অনুসারে অভিনেত্রীদের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তাঁর কাছে। নাটকের প্রয়োজনে অভিনেত্রীরা এসেছিলেন। যাঁরা এসেছিলেন, সমাজে তাঁদের স্থান ছিল নীচের দিকে। জাতপাত নয়, নগরের ঘৃণিত অঞ্চল' থেকে তাঁদের নাটকের মঞ্চে আনা হয়[১৮]।

আনোয়ারা বেগম : কলকাতার ছবিতে বনানী চৌধুরী ছদ্মনামে অভিনয় করতেন

ওই সময় নাটকে নারীরা এসেছিলেন প্রথমত: আর্থিক কারণে, দ্বিতীয়ত: নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য, তৃতীয়ত: সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে।

অবিভক্ত বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের গোড়াপত্তনের দিকে নাটকের রেশ কম-বেশি পরিমাণে ছিল। হীরালাল সেন প্রমুখ সেই সময় চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন নাটকের হাত ধরেই। যাঁরা এই চলচ্চিত্রে অভিনয়ে এসেছিলেন তাঁদের এক পা রাখা ছিল নাট্যমঞ্চে। অপর পা-টি ছিল চলচ্চিত্রে[১৯]। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) ছিলেন ঢাকার কলেজিয়েট স্কুল ও জগন্নাথ কলেজেরই ছাত্র। তাঁর জন্মস্থান মানিকগঞ্জে। ঢাকার জিন্দাবাহারে ছিল তাঁর দাদা গোকুল কৃষ্ণ সেন মুনশীর বাড়ি। তিনি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় নাট্যমঞ্চে অভিনীত জনপ্রিয় নাটকের খন্ডদৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেন। ওইসব দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন কুসুম কুমারী (আলীবাবা), প্রমদা সুন্দরী (ভ্রমর), হরিদাসী (সরলা), তারা সুন্দরী প্রমুখ। এঁরাই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম অভিনেত্রী[২০]।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটারের উদ্যোগে কাহিনীচিত্র নির্মাণ শুরু হয়। তখন সুনির্দিষ্টভাবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নির্বাচন শুরু হয়। প্রথম বাংলা নির্বাক কাহিনীচিত্র *বিল্বমঙ্গল* (১৯১৯) এ অভিনয় করেন এ্যাংলো ইন্ডিয়া মিস গহর। *বিলাত ফেরৎ* (১৯২১) ছবিতে অভিনয় করেন সুশীলা সুন্দরী। পরবর্তীকালে কলকাতার নির্বাক ও সবাক চিত্রজগতে মায়া রায়, প্রেমলতিকা, মোনা,

নীরদা সুন্দরী, নীহারবালা, প্রভা দেবী, উমাশশী, সবিতা, আঙুরবালা, তারকাবালা, নিভাননী, কংকাবতী সাহু, কাননবালা, জ্যোস্না গুপ্তা, যমুনা প্রমুখ অভিনয়ে জড়িত হন।

দেবীপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, "চলচ্চিত্রে প্রথম দিককার দিনগুলো অভিনেত্রীদের জীবনে স্বস্তিকর ছিল না। উঁচিয়ে থাকতো নানা প্রলোভনের হাতছানি। সেগুলোকে উপেক্ষা করে অভিনয় জীবনের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন[২১]।

ঢাকায় ১৯২০ দশকের একেবারে শেষ প্রান্তে নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে। তখন এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণের মতো স্টুডিও, প্রতিষ্ঠান ও সুযোগসুবিধা ছিল না। এছাড়া সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভংগী। ওই সময় ভদ্রঘরের কোনো মেয়েই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য রাজী হয়নি। এমতাবস্থায়, প্রথম পরীক্ষামূলক নির্বাক স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র *সুকুমারী*(১৯২৭-২৮)তে আবদুস সোবহান নামে একজন পুরুষকে নায়িকা সাজিয়ে নায়কের বিপরীতে অভিনয় করানো হয়[২২]। এ ছবি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন খাজা জহির। তিনি একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> 'নায়িকা সুকুমারী (অর্থাৎ আবদুস সোবহান) মাথায় শাড়ির আঁচল দিয়ে স্বামীর (খাজা নসরুল্লাহ) সঙ্গে যাচ্ছেন। এমন সময় অসাবধানতাবশত (নাকি অনভ্যাসবশত) হঠাৎ মাথার আঁচল সরে যায়। ফলে ছোট ছোট চুলওয়ালা পুরুষের মাথা বেরিয়ে পড়ে। ফিল্মের অভাবে দৃশ্যটি আর দ্বিতীয়বার নেয়া হয়নি এবং শুটিংয়ের সময় ক্যামেরাও বন্ধ রাখা হয়নি। প্রজেক্টরে ফিল্ম চালানোর সময় পর্দায় যখন শাড়ির আঁচলে ঢাকা রমণীর মাথা হঠাৎ পুরুষের মাথা হয়ে গেছে দেখায় তখন এ দৃশ্য দেখে ছবির নির্মাতারা যেমন আমোদ পেতেন তেমন যাঁরা দেখতেন তাঁরাও হেসে লুটোপুটি খেতেন[২৩]।

ঢাকার প্রথম নির্বাক চিত্র 'দি লাস্ট কিস'-এর নায়িকা লোলিটা

সুকুমারীর সাফল্যের পর নওয়াব পরিবারের উদ্যোক্তারা *দি লাস্ট কিস বা শেষ চুম্বন* নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র (নির্বাক) নির্মাণ করেন (১৯৩১)। এ ছবির বিভিন্ন নারী চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা সবাই ছিলেন অন্ধকার সমাজের বাসিন্দা, কেউ পতিতা, কেউ বাঈজী। ওই সময় ভদ্রঘরের কোনো নারীই চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে রাজি হয়নি। ছবির নায়িকা লোলিটা (বুড়ী)কে আনা হয় বাদামতলীর পতিতালয় থেকে, সহনায়িকা চারুবালা রায়কে আনা হয় কুমারটুলীর পতিতালয় থেকে, দেববালাকে আনা হয় জিন্দাবাহার গলি থেকে। আর হরিমতি ছিলেন নামকরা বাঈজী ও গ্রামোফোন রেকর্ডশিল্পী[২৪]।

১৯৪৭ এ ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্তির পর পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় নতুন করে চলচ্চিত্রসহ অন্যান্য সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়। স্টুডিও সহ চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে। এ সময় বাস্তবতার প্রয়োজনে মঞ্চাভিনেত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষিত নারীরা চলচ্চিত্রাভিনয়ে এগিয়ে আসেন।

আপ্যায়ন-এর নায়িকা পাঁপড়ি

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিঃ গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'আপ্যায়ন' এ নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে পাঁপড়ি। পরে তিনি সাদেকা সাঈদ নামে গল্প লিখেন[২৫]। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রয়াস *ঋতুমঙ্গল*-এ অভিনয় করেন স্কুল শিক্ষিকা আয়েশা আখতার[২৬]।

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে *মহুয়া* নামে একটি ছবির তৈরির কাজ চলে। ওই ছবিতে নায়িকা ছিলেন মঞ্চাভিনেত্রী রানী সরকার[২৭]। এসবই ছিল ঢাকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্মেষ পর্বের ঘটনা।

ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের সবচেয়ে বড় সফল উদ্যোগটি নেয় ইকবাল ফিল্মস লিঃ। এই প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় শিক্ষিত সচেতন নাট্যকর্মী আবদুল জব্বার খানের পরিচালনায় *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৪-১৯৫৬) নির্মিত হলে ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা পায়। এ ছবির নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দেয়া হলে

অনেক শিক্ষিত নারীরাও আবেদন করেন। *মুখ ও মুখোশ*-এর নায়িকা চরিত্রে মঞ্চাভিনেত্রী পূর্নিমা সেন, সহনায়িকা চরিত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জহরত আরা ও কলেজ ছাত্রী পেয়ারী বেগম (নাজমা), মঞ্চাভিনেত্রী রহিমা, বিলকিস বারী, ফায়জা, খালেদা অভিনয় করে ইতিহাসের অংশীদার হয়েছেন। কেননা, *মুখ ও মুখোশ* ছিল স্টুডিও ল্যাবরেটরীহীন পরিবেশে তোলা তৎকালীন সারা পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র[২৮]।

পূর্ণিমা সেন : (মুখ ও মুখোশের অন্যতম নায়িকা

ওই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঢাকায় নির্মিত এ ছবির নারী চরিত্রে রূপদানকারী পূর্ণিমা, নাজমা, জহরত আরার অভিনয়ের আলোচনা-সমালোচনা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

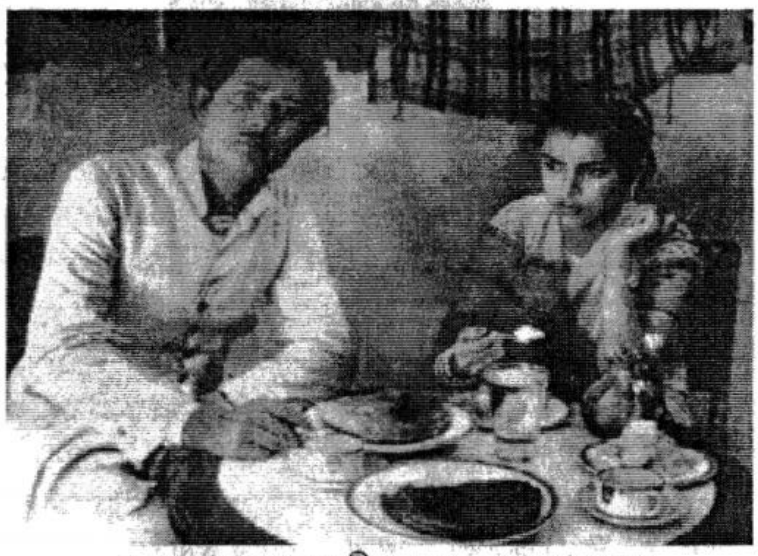

জহরত আরা ও আলী মনসুর : মুখ ও মুখোশ

মুখ ও মুখোশ-এর অন্যতম নায়িকা চরিত্রে রূপদানকারী পেয়ারী বেগমের নিজের বর্ণনায় জানা যায়- ওই ছবিতে তাঁর অভিনয় ও সমকালীন প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন :

> ছোটবেলা থেকেই ছবি দেখার প্রতি আমার একট ঝোঁক ছিল। কোনোমতে আট আনা, এক টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই চলে যেতাম ছবি দেখতে। টিকিটের দাম তখন ছিল ২৫ পয়সা। আমরা তাজমহল সিনেমা হলে দলবেঁধে ছবি দেখতে যেতাম। সুরাইয়া, মধুবালার ছবি দেখতাম। ছবি দেখতে দেখতে অভিনয় করার ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তখন তেমন পরিবেশ ছিল না। একদিন রেডিওতে গানের অডিশন দিতে গেলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। তবে অনুমতি পেয়েছিলাম নাটক আর আবৃত্তি করার।
>
> এসএসসি পাশ করে ভর্তি হই ইডেন কলেজে। একদিন কলেজে শুনি জব্বার খান নামে এক লোক ছবি বানাবে, এ জন্য অভিনেত্রী খুঁজছে। আমি আর আমার বন্ধু জহরত মিলে চুপিচুপি জব্বার খানের সঙ্গে তাঁর কায়েতটুলীর অফিসে যোগাযোগ করি। কিছুদিন পর জব্বার খান আমাকে খবর দেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। জব্বার খানের অফিসে গিয়ে দেখি মুরালী মোহন নামে একজন ফটোগ্রাফার আছে। মুরালী মোহন আমার ও আরও বেশ কয়েকজন মেয়ের ছবি ওঠালেন। সেসব মেয়ের মধ্যে থেকে আমাকে নায়িকা নির্বাচন করা হয়।
>
> কিছুদিন পর পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হলে বাবা তা দেখে ভীষণ চটে গেলেন। আমরা তখন পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। যেখানে আমরা ইচ্ছে করলেই বাড়ির বাইরে যেতে পারি না। সেখানে ছবিতে অভিনয় করা বা কোনো ছবির নায়িকা হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। বাবা আমাকে ডেকে শক্তভাবে বললেন, 'ছবি করা যাবে না। তুমি ছবির জন্য গেছ, নির্বাচিত হয়েছ, এটাই অনেক বেশি। তোমার ছবি করতে হবে না।' আমি সবকিছু জব্বার খানকে জানিয়ে বলি, আমি ছবি করব না'। একদিন জব্বার খান আমাদের বাসায় আসেন। বাবাকে অনেক বোঝানোর পর বাবা রাজি হন। আমাকে ছবি করতে দেবেন বলে জব্বার খানকে কথা দেন। জব্বার খানও কথা দেন এই বলে, আপনার মেয়েকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতো দেখে রাখব'।

পিয়ারী বেগম (নাজমা) : মুখ ও মুখোশের অন্যতম নায়িকা

ছবির কাজ শুরু হয়। শুটিংয়ের আয়োজন চলছে। ছবির মহরত হয় শাহবাগ হোটেলে। উদ্বোধন করেন এ কে ফজলুল হক। *মুখ ও মুখোশ* ছবির প্রথম শুটিং হয় টঙ্গীতে তুরাগ নদীর আছে। শুটিং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের মানুষ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন আধুনিক কোনো জমকালো আলো ছিল না, তাই সূর্যের আলোতে কাজ করতে হলো। ছবিটা তৈরি করতে অনেক সময়ও লেগেছিল।

মুখ ও মুখোশ ছবির আগে এ দেশের কোনো ছবিতে মেয়েদের তেমনভাবে দেখা যেত না। ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত। মাঝে মাঝে নর্তকী সেজে অভিনয় করানো হতো। পূর্ণাঙ্গ ছবির নায়িকা হিসেবে কোনো মেয়ের অভিনয়ে আমরাই ছিলাম প্রথম। এ জন্য মাঝে মাঝে কটুকথা শুনতে হতো। অনেকেই বলত, মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেছে। ভালো পরিবারের মেয়েরা কখনো ছবি করে না। আবার যারা আমার পরিবার সম্পর্কে জানো, তারা বলত, ছবি করা ভাল না, তবে আমি কেন এসব করি। আমার অনেক বান্ধবী আমার সঙ্গে মিশত না। আবার কেউ কেউ উৎসাহ দিত। আমাদের পুরান ঢঅকার কিছু মানুষ ছিল, যারা ভীষণ প্রগতিশীল। তারা অনেক উৎসাহ দিয়েছে আমাকে, আমার কাজকে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে। আর এটা নিয়ে ছিল আমার বড় মানসিক শক্তি। আমি একটু ঘরোয়া স্বভাবের ছিলাম বলে শুটিং আর কলেজ ছাড়া কোথাওয় যেতাম না। তাই রাস্তাঘাটে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কম। যে এলাকায় শুটিং হতো, সেখানে মানুষজন প্রায়ই জানতে চাইত আমি বাঈজী কিনা। এমন সব ছোট ছোট সমস্যার মধ্যে আমাদের শুটিং শেষ হয়।

ছবিতে আমার নাম পেয়ারী বেগম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমার আসল নাম পেয়ারা বেগম। পেয়ারা থেকে কীভাবে যে পেয়ারী হলো, আমি নিজে ঠিক বলতে পারি না।

আমরা তো ছেলেদের সঙ্গে তেমন মিশতে পারতাম না বা মিশতামও না। ছবি করতে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়। তাদের দুই-তিনজন আমাকে বেশ পছন্দ করত। তাদের মধ্য থেকে আমিনুল সাহেবকে আমার পছন্দ হয় তার স্মার্টনেসের জন্য। আমিনুল সাহেবের সঙ্গে রেডিওতে কাজ করতে গিয়ে পরিচয়। তবে মুখ ও মুখোশ ছবিতে এসে ভালো লাগার সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা একসময় জানাজানি হয়। এর কিছুদিন পর আমাদের বিয়ে হয়।

নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য ছবিতে আর কাজ করতে পারিনি ঠিক, তবে আমি যেদিন মুখ ও মুখোশ ছবিতে আমাকে দেখলাম, নিজের অভিনয় দেখতে গিয়ে আমরা বারবারই মনে হতো আমি মধুবালার অভিনয় দেখছি। এ পেয়ারী বেগম না, এ মধুবালা। সেদিন নিজের মধ্যে মধুবালার প্রতিমূর্তি দেখেছি।'[২৯]

মুখ ও মুখোশ ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী শিল্পীদের অভিনয়ের প্রথম পথ খুলে দেয়। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। এর ফলে চিত্রশিল্পের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে থাকে। আর সেই সঙ্গে ঢাকা তথা বাংলাদেশের নারী শিল্পীদের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রতিভা বিকাশ, পেশাগতভাবে, স্বামলম্বী হয়া, ও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রতিষ্ঠার পর চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন-এফডিসি)তে *আসিয়া* (১৯৫৯-৬০) চিত্রের কাজ শুরু হয়। এই চিত্রে নায়িকা হয়ে

আসেন মাদারীপুরের এক রাজনৈতিক কর্মীর স্ত্রী সুমিতা (১৯৩৬-২০০৪)। তাঁর আসল নাম হেনা ভট্টাচার্য। *আসিয়া* ছাড়াও তিনি পরপর *আকাশ আর মাটি* (১৯৫৯), *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯), *কখনো আসেনি* (১৯৬১), *সোনার কাজল* (১৯৬২), *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬৩), *সংগম* (১৯৬৪), *এইতো জীবন* (১৯৬৪), *বেহুলা* (১৯৬৬) প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন এবং পরে তিনি প্রযোজিকা হন। তাঁকে বলা হয়, ঢাকার ছবির ফার্স্ট লেডি। চিত্রজগতে তাঁর আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় তাঁর নিজের জবানীতে[৩০]। সুমিতার স্বামী অতুল লাহিড়ী ছিলেন একজন সৌখিন ফটোগ্রাফারও। স্বামীর উৎসাহ ও আগ্রহেই তিনি চলচ্চিত্রে জড়িত হন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও।

অব্যয় রহমান লিখেছেন :

> বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের উষালগ্নে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। এফডিসি হওয়ার পর চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম পুরোধা ছিলেন সুমিতা দেবী। এই প্রতিভাবান অভিনেত্রী বাংলা চলচ্চিত্রকে করেছেন সমৃদ্ধ। চলচ্চিত্র শিল্পে শিক্ষিত ও সংস্কৃতজন নারীশিল্পীদের আগমনের পথকে করেছিলেন মসৃণ। আমরা জানি রক্ষণশীল বাঙালি সমাজে অভিনয় শিল্প আকর্ষণীয় হলেও এতে নারীদের অংশগ্রহণ ধর্মীয় ও সামাজিক কারেণে ছিল প্রায় নিষিদ্ধ।

সুমিতা দেবী

> সুমিতা দেবী ছিলেন শিক্ষিত, রুচিশীল ও সাংস্কৃতিক পরিবারের মেয়ে এবং এক রাজনৈতিক কর্মীর স্ত্রী। চিত্রজগতে তাঁর জড়িত হওয়ার ব্যাপারটি একদিকে যেমন নিঃসন্দেহে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক তেমন পেশাগতভাবে প্রতিভা বিকাশের জন্য স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালী নারীর অগ্রযাত্রারও নিদর্শণ[৩১]।
>
> এফডিসির সহায়তা নিয়ে তৈরি মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র *জাগো হুয়া শাভেরা*'র নায়িকা হয়ে অভিনয়ের জন্যে ঢাকা আসেন কলকাতার প্রখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র। এ ছবিতে আরো অভিনয় করেন ঢাকার ক'জন অভিনেত্রী। এঁদের মধ্যে ছিলেন শাহানা, চাঁদ বেগম, ময়না, নাসিমা প্রমুখ[৩২]।

সুমিতার পথ ধরে এফসিডিতে নির্মিত উন্মেষলগ্নের আরেকটি চিত্র *মাটির পাহাড়* (১৯৫৯) এ নায়িকা হয়ে আসেন আরো দু'জন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। এঁদের একজন ক্যামেরাম্যান কিউ এম জামানের স্ত্রী, সুলতানা জামান (রাজিয়া)। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর স্বামীর সহযোগিতার কারণে। তিনি পরে আরো কয়েকটি ছবিত অভিনয় এবং ছবি প্রযোজনা করেন। আরেকজন ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী রওশন আরা। রওশন আরা পরে *'যে নদী মরু পথে* (১৯৬১) এবং *সূর্যস্নান* (১৯৬২) চিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীকালে আরো কয়েকজন অভিনেত্রী ঢাকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন চিত্রা সিনহা ও নার্গিস মোরশেদা (রাজধানীর বুকে ১৬৬০), শবনম (চান্দা), কবরী (সুতরাং-১৯৬৪), রোজী (সংগম-১৯৬৪), সুজাতা (দুই দিগন্ত-১৯৬৪), সুচন্দা (কাগজের নৌকা-১৯৬৬), শাবানা (চকোরী-১৯৬৭), ববিতা (সংসার-১৯৬৮) প্রমুখ।

চলচ্চিত্রে নারী শিল্পীদের বেশি সংখ্যায় জড়িত হওয়ার মূল কারণটি ছিল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও পেশাগতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাসসাস) ১৯৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে এবং সরকার ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে অভিনয় ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ সহঅভিনেত্রীর জন্য পুরস্কার প্রদানের নিয়ম ঘোষণা করে। এর ফলে ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী শিল্পীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্বীকৃতি পায়।

চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপন

চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনার ধরণ, স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। নারীবাদী দর্শক-তাত্ত্বিক লেখকরা চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনার বিষয়ে পুরুষের আধিপত্য ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ফওজিয়া খান প্রখ্যাত নারীবাদী লেখক লা মালভির সহায়তা নিয়ে লিখেছেন যে নারী চরিত্র সবসময়ই নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাসীন পুরুষ চরিত্রগুলোর কামনার বস্তুগত। তিনি লিখেছেন–

> চলচ্চিত্রের বর্ণনায় পুরুষের চরিত্রেরা চোখ রাখে নারীদের দিকে। পুরুষ চরিত্রের কামজ দৃষ্টিকোণে দৃশ্যায়িত চলচ্চিত্র মিলনায়তনের দর্শককে এই পুরুষ ছবির সাথেই একাত্ম করে তোলে। ক্যামেরার প্রেক্ষণবিন্দু, চরিত্রায়ন এবং দৃশ্যায়নের কলাকৌশল চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোকে দেখবার জিনিস হিসেবে উপস্থাপন করে[৩৩]।

ঢাকার চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়।

চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তু বা কাহিনীর প্রয়োজনে প্রারম্ভ, মধ্য ও অন্ত ঘটনার বিন্যাস রচনায়, প্রেম-ভালবাসা, ঘৃণা-হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ, স্নেহ-মায়ামমতা-রোমান্টিকতা; দায়িত্ব পালন, নাচ-গান, সংলাপ, রূপ-গুণ, আচার-আচরণ, যৌনতা-পরিবেশ-প্রতিবেশ, বাণিজ্য-নান্দনিকতা ইত্যাদি উপাদান সংযোজন বিয়োজনে বা পুরুষ চরিত্রের প্রয়োজনে

নারী চরিত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এসব চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় আত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত (যেমন-মা, সৎমা, খালা, বোন, ভাবী, শ্যালিকা, সহপাঠিনী, বান্ধবী, পরিচিতা ইত্যাদি), পেশাভিত্তিক (যেমন-গৃহিণী, চাকরানী, পতিতা, বাঈজী, অভিনেত্রী, গায়িকা, চাকুরীজীবী, সর্দারণী, নার্স, ডাক্তার, পুলিশ, এজেন্ট ইত্যাদি), গুণাবলী ভিত্তিক (যেমন- সতী, বিনয়ী, সৎ, শান্ত, চঞ্চলা, ঝগড়াটে, হিংসুটে, লাজুক, হাস্যোজ্জ্বল, ধর্মভীরু, স্নেহশীলা ইত্যাদি), শারীরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (যেমন- হালকা-পাতলা, লম্বা, সুস্থ, বন্ধ্যা, খাটো, প্রতিবন্ধী, রূপসী, কালো, একহারা-দোহারা, শিশু-কিশোরী, বয়স্কা ইত্যাদি), আর্থিক অবস্থা ভিত্তিক (ধনী, গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ইত্যাদি), বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, গ্রামীণ, শহুরে, আদিবাসী, অভিবাসী, দেশীয়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পরিস্থিতির শিকার (বন্দিনী, রক্ষিতা, অপহৃতা ইত্যাদি)।

রওশনআরা

যে কোনো চরিত্র তা পুরুষ বা নারী হোক না কেন চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বা কাহিনীর প্রয়োজনে বাস্তবানুগভাবে উপস্থাপিত হওয়া বাঞ্ছণীয়। এতে থাকতে হবে চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্যও। কেননা, শুধুমাত্র ক্যামেরায় ধারণ করে পর্দায় তা দেখালেই চলচ্চিত্র হয় না। তবে বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের নামে যা চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে তা আসলে ক্যামেরায় ধারণ করা এক ধরনের মনোরঞ্জনকারী বিচিত্রানুষ্ঠান যাতে থাকে ফরমূলা ভিত্তিক কিছু ঘটনার ঘনঘটা, নাচ-গান, মারপিট, হিংস্রতা, যৌনতা ইত্যাদি উপাদান। চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলো কাহিনী বা ঘটনার বাস্তবতা ও প্রয়োজনের আলোকে নান্দনিকতা, শ্লীলতা আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক-পরিবেশ ও উন্নয়ন ইত্যাদি দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত।

সুলতানা জামান

চলচ্চিত্র প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প মাধ্যম ও বাণিজ্যিক পণ্য। ব্যয়বহুল এই পণ্যটি দর্শক বা ভোক্তাদের কাছে বিক্রির জন্য নির্মাতা-প্রযোজকরা 'নারী'কে নানাভাবে আকর্ষণীয়ভাবে ব্যবহার করে থাকে। চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের উপস্থাপনা কি রকম হবে তা নির্ভর করে প্রযোজক-পরিচালক-তারকা ও দর্শকদের উদ্দেশ্য ও মানসিকতার ওপর। কারিগরি উৎকর্ষ, দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি, সময়ের দাবি ও ধারা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনও নারী চরিত্রের উপস্থাপনায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়া চলচ্চিত্রের সারমর্ম, ফরম্যাট, বাজেট, মূলধারা, বিকল্পধারা, প্রযোজক, পরিচালক শিল্পীর সম্পর্ক, কারিগরি প্রকৌশল, সেন্সর বিধিও নারী চরিত্রের উপস্থাপনায় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ঢাকায় চলচ্চিত্রে শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর। এর আগে আবদুল জব্বার খান স্বরচিত *ডাকাত* নাটক চলচ্চিত্রায়িত করেন *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) নামে। এই অপরাধচিত্রে প্রধান দুটি নারী চরিত্র কুলসুম ও রাশিদা, অপহরণ ও নানা নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু তারা প্রতিবাদ করে না।

এফডিসির প্রতিষ্ঠার প্রথম ৬/৭ বছরের মধ্যে রুচিশীল ও সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এ সময়ে প্রযোজক-পরিচালক ও শিল্পীরা ছিলেন কমিটেড। তাদের চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোর উপস্থাপনা ছিল মোটামুটি বাস্তবসম্মত, শ্লীল। কিন্তু পরবর্তীতে ষাটের দশকে বাণিজ্যিক কারণে রূপকথার অবাস্তব এবং আশি ও নব্বই দশকে অশ্লীল নারী চরিত্র যোগ করা হয় এবং নারীর অশ্লীল উপস্থাপনের মাত্রা

ছাড়িয়ে যেতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে অশ্লীল চলচ্চিত্র নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত উঠেছে।

নাসিমা খান

এফডিসিতে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটির নামই ছিল প্রধান নারী চরিত্রের নামে *আসিয়া* (১৯৫৭-১৯৬০)। গাঁয়ের মেয়ে আসিয়া বিয়ে হয় শৈশবের খেলার সাথি ও প্রেমিক মাসুদের চাচার সঙ্গে। অতঃপর আর্থ-সামাজিক-মানসিক পরিস্থিতির শিকার হয় এই নারী চরিত্রটির মৃত্যু ঘটে। দেশ গড়ার অঙ্গীকারের চেতনা নিয়ে নির্মিত *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯) এর নায়িকা প্রভাবশালী পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণ প্রেমিকের পাশে দাঁড়ায় এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

রাজধানীর বুকে (১৯৬০) বাণিজ্য সফল চলচ্চিত্র হলেও এর নারী চরিত্রগুলোর উপস্থাপনায় অশ্লীলতা ছিল না। এ ছবিতেই রয়েছে সেই গান তোমারে লেগেছে এত যে ভাল'-তবে পুরুষ কণ্ঠে হলেও লক্ষ্য কিন্তু নারীল এবং তার গভীর প্রেমের আবহ। *যে নদী মরুপথে* (১৯৬১) চিত্রে রয়েছে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক সাধারণ মেয়ের অসাধারণ গল্প। *হারানো দিন* (১৯৬১) এর মালার জীবন ও প্রেম নির্যাতনের শিকার হয় পালনকর্তা জমিদারের কারণে।

জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র *কখনো আসেনি* (১৯৬১) কিছুটা সুররিয়ালিজম আক্রান্ত। নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কতটা অসহায় পরিচালক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা দেখিয়েছেন। এর প্রধান চরিত্র মেরি বা মরিয়ম বন্দিনী বা রক্ষিতা হয়ে থাকে ধনাঢ্য এক খেয়ালী ব্যক্তির কাছে। শিল্পী শওকতকে ভালোবেসে সে নির্যাতনের শিকার হয়। অন্যদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত শওকতের দু'বোন আত্মহত্যা করে।

চিত্রা সিনহা

সালাহউদ্দীনের *সূর্যস্নান* (১৯৬২) এ মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে নারী নির্যাতন ও অপহরণ। মালিকের লোভ ও অত্যাচারে শ্রমিকের স্ত্রী নিহত বলে শ্রমিক প্রতিশোধ হিসেবে মালিকের মেয়ে রীতাকে অপহরণ করে। জহির রায়হান এর *কাঁচের দেয়াল* (১৯৬১) এ এক এতিম আশ্রিতা মেয়ের অসহায়ত্ব সার্থকতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়েটির ভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে লটারির টিকেটকে। এ ছবিতে গীত সুকুমার নন্দিত গান (শ্যামল বরণ মেয়েটি) এর মধ্যে ফুটে ওঠেছে মধ্যবিত্তের কারাগারে বন্দি নারীদের অবস্থা। ফ্রাংকফূর্ট আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত সুভাষ দত্তের *সুতরাং* (১৯৬৫) এর কিশোরী জরিনার সরলতা, প্রেম ও স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ধনী পিতার কারণে। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে গৃহত্যাগী জরিনা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে পরিশেষে মারা যায়।

সাদেক খানের *নদী ও নারী* (১৯৬৫) সাহিত্য ভিত্তিক কাহিনীর মৌলিকত্বে, চলচ্চিত্রের ভাষায়, কারিগরি উৎকর্ষে, বাংলাদেশের নদীবিধৌত চরাঞ্চলের নর-নারীর প্রেম-ঘৃণা-সংঘাত-সংগ্রামের বাস্তব আলেখ্য। এই চলচ্চিত্রের আমেনা, আয়েশা, কুলসুম ও অন্যান্য নারী চরিত্র পুরুষ শাসিত দোর্দণ্ড প্রতাপের মধ্যেও স্বাভাবিক বাঙালি রমনীদের মতোই প্রেম-সৌন্দর্য-কর্তব্যে উজ্জ্বল। এই চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রের নান্দনিক উপস্থাপনা সম্পর্কে তানভীর মোকাম্মেলের মন্তব্য :

> নৌকা দিয়ে দুই বন্ধু গ্রামে ফিরে আসে। পারে নেমে তারা দেখে কলসি কাঁখে এক সুন্দরী তরুণী। আসগর বলে, ওই তো মামীর মাইয়া আমিনা। নীচুভাবে কামেরা ধরা। ফোরগ্রাউন্ডে নদীর জল, পেছনে স্নানরতা বা কলসি কাঁখে নারীরা। এই বিশেষ ধরনের উপস্থাপনা নদী ও নারীর মধ্যে এক সম্পর্কসূত্র যেন অন্বেষা করে। নারীর অসহায়তা, যাকে পুরুষ প্রধান সমাজ চিরকাল নারীর রহস্যময়তা বলে মনে করেছে, নদীর

গতিপথের রহস্যময়তার কারণে তাকে সহজেই তুলনা করেছে নারীর সঙ্গে। নারীর দেহের বাঁকে নদীর বাঁক, তবে আরো গভীর সমাজ-নৃতাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। নদী পলি দেয় শস্য, নারী-সন্তান। পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যে নদী ও নারীর প্রতীককে প্রায়শই সমার্থক দেখেছেন, সেটা হয়তো অস্বাভাবিক নয়।

নদীর মতো নারীর স্বরূপও বিভিন্ন থেকেছে। কাশবনের কন্যার সারল্য, কপিণার উচ্ছলতা, আমিনার দুঃখভোগের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা-এসবই নদীর বিভিন্ন রূপেরই প্রতিফলন যেন। বাঙালি নারীর ধৈর্য্যকামিতার মধ্যে নদীর সব সহনশীলতার প্রতীক খুঁজে পেয়েছে বাঙালি পুরুষ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। আমিনা সেই আঁদলেই গড়া এক চরিত্র। আত্মহত্যা করতে আমিনার নদীর পার ধরে ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটি silhouette-র এক চমৎকার ব্যবহার। এই বিশেষ শটটিতে ছবির সঙ্গীতাংশও যথার্থ নাট্যরস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সূর্যস্নান ছবিটিতেও জলে ডুবে নারীর আত্মহত্যার শটে silhouette র ব্যবহার আমরা দেখেছিলাম। দুটিই অত্যন্ত সফল ব্যবহার।

এ সেই সামাজিক আবহ যেখানে মেয়ে-মানুষের স্বামী গৃহস্থালী ভিন্ন অন্য গতি নেই। ফলে সলজ্জ ভঙ্গিমায় যে নারী এসে খাবার দেয়, সেই কুলসুমের সঙ্গে সহজেই আজিজের বিয়ে হয়ে যায়। আবার পদ্মার জলে কুলসুমের মৃত্যুও স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে রয়। লং শটে, কিছুটা লো-অ্যাঙ্গেলে নদীর কিনারে ভাসমান কুলসুমের মৃতদেহ ভেসে যা দেখে আজিজ প্রকৃতিস্থতা হারায়। নদী যেন নিয়তির মতো টানে, এ ছবির সব চরিত্রকেই বিশেষ করে নারীদের। আবার এটাও নিয়তি, বেশ্যাপল্লীটিও নদীর কাছেই নারী পণ্য হয়। নদীর কিনারেই[৩৪]।

ষাট দশকের উর্দু ভাষায় চলচ্চিত্রের ভিড়ে সালাউদ্দিনের লোকগাঁথা ভিত্তিক চলচ্চিত্র *রূপবান* (১৯৬৫) বাংলা ছবির উদ্ধারকারী কোরামিন হিসেবে কাজ করে। রূপকথার অবাস্তব এক কাহিনরীর নারী চরিত্রে ১২ বছরের রূপবানকে ১২ দিনের শিশু রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ের পর বনে যেতে হয়। দরবেশের অভিশাপদুষ্ট শ্বশুরের অপরাধ মোচনের জন্য। *রূপবান* এর বাণিজ্যিক সাফল্য রূপকথা ও লোকগাঁথা ভিত্তিক আরো চলচ্চিত্রের আরো নারী চরিত্র পর্দায় উপস্থাপিত হয়। এ ধরনের চলচ্চিত্র নিয়তিবাদ, সাধু-সন্ন্যাসী-দৈত্য-পরী-জীবনের অশুভ বা শুভ দৃষ্টি, রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যা, উজির-মন্ত্রী, সিপাহশালার-জল্লাদ, সাপ-ব্যাঙ ইত্যাদি শোভিত থাকে।

সুজাতা : রূপবান চলচ্চিত্রে

অতঃপর এভাবেই তৈরি হয় আবার *বনবাসে রূপবান, রহিম বাদশা ও রূপবান, বেহুলা, জরিনা সুন্দরী, কাঞ্চনমালা, মধুমালা, সাতভাই চম্পা* ইত্যাদি আরো লোক ছবি। এসব ছবির নারীরা রূপে-গুণে-প্রেমে সেরা হলেও বাস্তব জগতের নয়।

ষাট দশকের একটি উল্লেখ্যযোগ্য চলচ্চিত্র খান আতাউর রহমানের *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭)। ঐতিহাসিক এই চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রে বাঈজী আলেয়া ও নবাব বেগম লুৎফুন্নেসার ত্যাগ ও দেশপ্রেম স্মরণীয় হয়ে আছে।

জহির রায়হানের *আনোয়ারা* (১৯৬৭) সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপ। মুসলিম বাংলার নান্দিত উপন্যাস ভিত্তিক এই চলচ্চিত্রের আনোয়ারা'র স্বামীভক্তি, ধর্মপ্রীতি দর্শক স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই চিত্রে সৎমার ষড়যন্ত্র, বান্ধবী হামিদার সহমর্মিতা, দাদীর স্নেহমমতা, আবহমান বাঙারি রমনীদের সার্থক প্রতিফলন।

একেবারে ভিন্ন ধরনের নারী চরিত্র পাওয়া যায় জহির রায়হানের রাজনৈতিক রূপকধর্মী চলচ্চিত্র *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০)য়। এ দেশের ভাষা আন্দোলন, একুশের গান, প্রভাত ফেরী, মিছিল, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্রের ছায়া এ ছবির নারী চরিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে। বড় বোন (রওশন জামিল) এর চরিত্রটি সামরিক শাসক ও এক নায়ক আয়ুব খানের প্রতীক, সাথী ও বিথী পাকিস্তানের দুই প্রদেশের প্রতীক আর চাবির গোছা হচ্ছে ক্ষমতার প্রতীক।

কামাল আহমেদের উপন্যাস ভিত্তিক *অবাঞ্ছিত'* (১৯৬৯) এ বন্ধ্যা নারী এবং সুভাষ দত্তের *বিনিময়* (১৯৭০)-এ প্রতিবন্ধী বোবা নারীর কথা চিত্রিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক, পরিবেশিক জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা ও মাত্রা যোগ করে। এর প্রভাব পড়ে চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রেও। নারীরা হয় মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন, প্রেমিকা, কেউ হয় খান সেনা-রাজাকার-দালালদের দ্বারা ধর্ষিতা-নির্যাতিতাও, কেউ হয় বীরাঙ্গনা। কিছু লোভী প্রযোজক-পরিচালক এ সময় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে ধর্ষিত নারীর নগ্ন ও বিকৃত রূপ তুলে ধরে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ সময় আমরা কিছু ভালো নারী চরিত্রের উপস্থাপনা পাই চলচ্চিত্রে। এ সবের মধ্যে রয়েছে চাষী নজরুল ইসলামের *ওরা ১১জন* (১৯৭২)এর শীলা, মিতা, মুক্তিযোদ্ধা আবু ও সাবুর মা, মুক্তিযোদ্ধা খসরুর মা ও বোন। এদের ত্যাগ তিতিক্ষা দেশপ্রেমের নিদর্শন, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবদানে সমৃদ্ধ। সুভাষ দত্তের *অরুনোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* (১৯৭২)র বীরাঙ্গনা মা, আলমগীর কবীরের *ধীরে বহে মেঘনা* (১৯৭৩)র নাজমা, অনীতা, মিতার *আলোর মিছিল* (১৯৭৪) এর আলো, হারুনর রশীদের *মেঘের অনেক রং* (১৯৭৬) এর ধর্ষিতা মা ও নার্স মাথিন, হুমায়ূন আহমেদের *আগুনের পরশমনি* (১৯৯৪)র মতিন সাহেবের স্ত্রী, দুই মেয়ে ও কাজের মেয়ে, চাষী নজরুল ইসলামের *হাঙ্গর নদী গ্রেনেড'*এর বুড়ী মা-প্রভৃতি নারীর মায়ামমতা, ত্যাগের উপস্থাপনা এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়গাঁথায় মাখা। এই নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের জুগিয়েছে প্রেরণা। খান আতাউর রহমানের *আমার তোরা মানুষ*

হ (১৯৭৩) চিত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা স্মরণে রেখে কলেজ ছাত্রীর কণ্ঠে গীত *এক নদী রক্ত পেরিয়ে, বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলো যারা, তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না* বারবার গাইতে ইচ্ছে করে।

রহমান ও শবনম : হারানো দিন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে আরো যেসব নারী চরিত্র আঙ্গিক ও ভাষাগত কারণে, বাস্তব ও নান্দনিক উপস্থাপনায়, চরিত্র মাহাত্ম্যে, অভিনয়ে নৈপুন্যে, শালীনতাবোধে, জীবন সংগ্রামের চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে আছে সেসবের মধ্যে রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) এর বাসন্তী ও অনন্তের মা, আমজাদ হোসেনের *নয়নমণি* (১৯৭৫)র মনি, সুভাষ দত্তের *ডুমুরের ফুল* (১৯৭৮) এর স্নেহময়ী নার্স রোকেয়া, *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) এর গোলাপী *ভাত দে*'র ক্ষুধার্ত স্ত্রী, মশিহউদ্দীন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর *সূর্য দীঘল বাড়ি*'র দরিদ্র, উদ্বাস্তু ও সংগ্রামী জয়গুন, মায়মুন, শফির মা, আঞ্জুমান, লালুর মা, গেদির মা, আবদুল্লাহ আল মামুনের *সারেং বউ* (১৯৭৮) এর নবীতুন *বিহঙ্গ* (২০০১) এর প্রতিবন্ধী মেয়েরা, চাষী নজরুল ইসলামের *দেবদাস*-এর পার্বতী ও চন্দ্রমুখী, শুভদা'র শুভ দা, মতিন রহমানের *লাল কাজল* (১৯৮২) এর বন্ধ্যা কাজের মেয়ে, আলমগীর কবিরের *সূর্যকন্যা* (১৯৭৫)র মনিকা ও লাবণ্য, *সীমানা পেরিয়ে* (১৯৭৭) এর টিনা, রাজেন তরফকাদেরর *পালংক* (১৯৭৬) এর মকবুলের স্ত্রী, গৌতম ঘোষের *পদ্মা নদীর মাঝি*'র মালা ও কপিলা, মোরশেদুল ইসলামের *দুখাই* (১৯৯৭) এর ঝড়ে বিধ্বস্ত স্ত্রী ও কন্যা, রাজ্জাকের *সন্তান যখন শত্রু*'র সৎ মা, তানভীর মোকাম্মেলের *লাল সালু* (২০০২) এর রহিমা ও জমিলা।

কবরীর *আয়না*, নারগিস আখতারের *চার সতীনের ঘর*, তানভীর মোকাম্মেলের *রাবেয়া* চিত্রের নারী চরিত্রগুলোতেও বাস্তবতার ছাপ রয়েছে।

সামাজিক কুসংস্কার, স্বামীর অত্যাচার, মোড়লের শাসানি, যৌতুকের অভিশাপ, বেকারত্বের অভিশাপ, সতীনের জ্বালা, পরপুরুষের লালসা, অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে আছে গোলাপী, জয়গুন, নবীতুন, জমিলা প্রভৃতি চরিত্রগুলো।

সারেং বউ-এর নবীতুন সম্পর্কে লিখেছেন একজন সমালোচক :

> সারেং বউ-এর নির্মাতার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বটি হচ্ছে আমাদের সমাজে অরক্ষিত নারীকূলের নিরাপত্তাহীনতার চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্তমান সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থান দৃশ্যমান করা। পুরুষ শাসিত সমাজে রক্ষকহীন নারীর অস্তিত্বই বিপন্ন। অন্য কথায় পুরুষের সমাজ স্বীকৃত রক্ষিতা তথা সহধর্মিনী হিসেবেই তার অবস্থান নিরাপদ কেবল, স্বীয় অস্তিত্বের বলে নয়। অরক্ষিতা নারী যেন সমাজপতিদের প্রোপার্টি। এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারীদের নবীতুনের মতো সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামে বিজয়ী বিদ্রোহীদের সংখ্যা স্বল্প। বেশির ভাগই তেজ দেখায় রাগ দেখায়। রাগের চোটে হাঁড়ি ভাঙ্গে, গালি ছোঁড়ে। তারপর আস্তে আস্তে নরম হয়। টোপ গেলে।...দাসী বান্দীর খেদমতের লোভ, দু-পদ জোর, বড় জোর কিছু নগদ টাকার কাছে গাঙের পানি। গাঙের পানির মতোই ভেসে যায়। এই যখন অবস্থা তখন কারও কি কিছু করণীয় নেই? কার কি করণীয় তা লেখক বা চলচ্চিত্রকার কেউই বাৎলে দেনি। তাঁদের দায়িত্বও সেটা নয়। লেখক সমস্যা ব্যক্ত করেছেন, চলচ্চিত্রকার সেটা ভিস্যুয়াল করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে জনতার বিবেক জাগ্রত হবে, হয়ত সেটাই চলচ্চিত্রকারের আশা[৩৫]।

মূল ধারার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, মুক্তদৈর্ঘ্য চিত্র এবং বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রেও কিছু নারী চরিত্র সার্থক ও শোভনতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এসবের মধ্যে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইডে* (১৯৭১) এর সীমান্ত পার হওয়ারত বৃদ্ধা, ধর্ষিতা বোবা কিশোরী, বাবুল চৌধুরীর *ইনোসেন্ট মিলিয়ন* (১৯৭৯) এর শরণার্থী শিবিরের অসহায় নারীগণ, মোরশেদুল ইসলামের *আগামী* (১৯৮৪)র মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী, তানভীর মোকাম্মেলের *হুলিয়া* (১৯৮৫) এর মা, আবর্তনের কেরানীর স্ত্রী, নওয়াজেশ আলী খানের *জননী*র সর্বংসহা স্ত্রী, তারেক মাসুদের *মাটির ময়না* (২০০২) এর আনুর মা, শামীম আখতারের *সে, ইতিহাস কন্যা, শিলালিপি* ইয়াসমিন কবিরের *স্বাধীনতা* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার চলচ্চিত্রে বিশেষ করে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনের বিষয়ে রয়েছে ভয়াবহ এক বিপরীত চিত্রও। এই চিত্রে রয়েছে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে অশ্লীল ও কদর্যভাবে নারীর শরীর, অভিনয়, নাচ, গান, সংলাপ, আচার-আচরণ ব্যবহার করা।

আনোয়ারা : বালা

শেখ মাহমুদা সুলতানা 'ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীর দানব, দেবতা ও পতির বাজ্যে নষ্টা, একস্ট্রা, ও সতী' শিরোনামে এক প্রবন্ধে নারীর উপস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ঢাকার চলচ্চিত্রের পর্দায় উপস্থাপিত নারী চরিত্রের প্রায় সবাই পতিপ্রাণ সতী, এদের স্থানে গৃহে, এদের অন্য কোন পেশা নেই, এরা যৌন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, এরা পূজণীয় মাতৃত্বরূপে অধিষ্ঠিত, নারীরাই নারীর শত্রু, এরা প্রথার হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদি সহিংসতার শিকার ও একস্ট্রা চরিত্রগুলো (ভ্যামরা নর্তকী, সহবরীরা) যৌনতা সর্বস্ব এবং সাম্প্রতিককালে নারী চরিত্রে কৃত্রিম পুরুষালী স্বভাব-আচার-আচরণ সজ্জায় ফুটে[৩৬]।

স্বাধীনতার পর কিছু দায়িত্বহীন অতিলোভী প্রযোজক-পরিচালক ও শিল্পী অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন ও কালো টাকা সাদা করার জন্য চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করে। তারা চলচ্চিত্রে নকল কাহিনী, মারপিট, ভাঁড়ামো ও অশ্লীল নাচ-গান সংযোজন করে। আশির দশকে ভিসিআর এবং নববই দশকে স্যাটেলাইট টিভি ও বৈদ্যুতিক মাধ্যমে সহজে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে পাল্লার দেয়ার অজুহাতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও শুরু হয় নারীদেহের নগ্ন ও উত্তেজক উপস্থাপনা, কাটপিস সংযোজন, অশ্লীল নাচ-গান-সংলাপের ব্যবহার। এর ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শকরা সপরিবারে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখা ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে কুরুচিপূর্ণ ছবি দেখে সমাজে নানা ধরনের অপরাধ বাড়তে থাকে।

আশি ও নব্বই দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ চলচ্চিত্রে নারী দেহের অশোভন উপস্থাপন দেখা যায়। চলচ্চিত্রের অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয়ের জন্যে বিদেশ থেকেও অভিনেত্রী আমদানি করা হয়। নানা চরিত্রে, নানা ঘটনা ও পরিবেশে, ক্যামেরার নানা অ্যাঙ্গেলে নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়। কখনো প্রেমের দৃশ্যে, কখনো নাচ বা গানের দৃশ্যে, বৃষ্টির পানি বা সাগর নদীতে ভিজিয়ে, গাছে উঠিয়ে, কখনো ধর্ষণের নামে, কখনো গানের কথা ও সংলাপে, কখনো কৌতুক ভাঁড়ামোর নামে, আবার কখনো গুণ্ডা-ডাকাত-মাস্তান বানিয়ে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে নানা রং-ঢংয়ে।

চলচ্চিত্রে নারীর অশ্লীল ও অশোভন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতন মহল এমনকি খোদ চিত্রজগতেও মিটিং-মিছিল-প্রতিবাদ হয়েছে, সেন্সর বোর্ড ও তথ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। চিত্রজগতের বর্ষিয়ান অভিনেত্রী সুমিতা দেবী এবং অভিনেতা পরিচালক রাজ্জাকও এই প্রেক্ষিতে নীরব থাকতে পারেননি। তাঁরা আক্ষেপ করে পত্রিকান্তরে জানিয়েছেন যে, তাদের মৃত্যুর পর লাশ যেন এফডিসিতে না নেয়া হয়।

চলচ্চিত্রে নারীর অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি প্রদর্শনের পাশাপাশি সংলাপ বা গানের মধ্যেও অশ্লীল ভাষা, শব্দ, ধ্বনি ব্যবহার করা হয়েছে নারীকে কেন্দ্র করে। যেমন গানের মধ্যে কচি ডাবের পানি, গাছে পাকা জাম্বুরা ফল, অই চেঢ়ি তোর, আমি পাঠা তুমি পাঠী ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। বন্ধু যখন শত্রু ছবির একটি গানের মধ্যে রয়েছে :

আজকে রাতে তোমার সাথে
খেলব মজার খেলারে
উপরে খোলা নিচে খোলা
চোখে নাই তালা রে।[৩৭]

অন্য আরেকটি ছবি 'বিশাল হাঙ্গামা'য়ও রয়েছে :

'নায়ক। চিন্তা নাই মধু আমি খাবো
সব জ্বালা সব মিটাবো
চলনারে প্রেম করি চিপায় যাইয়া।'[৩৮]

কাল্লু মামা ছবিতেও রয়েছে অশ্লীল গান। যেমন:

'বল দিবি কিনা
একটি মিনিটের কাম
মনটা আমার করে শুধু
বাইরাম বাইরাম।'[৩৯]

অন্য একটি ছবিতেও রয়েছে অশ্লীল কথার গান:

'বন্ধু তোমার ছোঁয়া পেয়ে
অঙ্গ আমার ভিইজ্যা গেল।'[৪০]

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনা বিশেষ করে অশ্লীলতা নিয়ে গবেষণা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক-শেখ মাহমুদা সুলতানা ও গীতি আরা নাসরীন। দু'জনের গবেষণাতে উল্লেখ করা হয়েছে মেয়েরাও *মাস্তান* (২০০২), *তের পাণ্ডা এক গুণ্ডা* (২০০০), *রাঙা বউ* (১৯৯৮), *লেডি র‍্যাম্বো, ভয়ংকর বিষু* (১৯৯৯), *আম্মাজান* (১৯৯৯), *ধর, কষ্ট* চিত্রে নারীর অপব্যবহার প্রসঙ্গে।

কবরী সুতরাং

এর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে শেখ মাহমুদা সুলতানার রাঙা বউ (১৯৯৮) চলচ্চিত্রের বিশ্লেষণ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো :

'রাঙাবউ : সিকোয়েন্স এক

স্থান: বাইজি নাচের স্থল

একটি জনপ্রিয় হিন্দি সঙ্গীত ব্যাকগ্রাউন্ডে বেজে চলে।

প্রথম শট

ক্লোজ শটে দুটো নারী শরীর মুখোমুখি দণ্ডায়মান, এদের স্তনদ্বয় পরস্পরের সাথে যুক্ত, স্ক্রীনের কেন্দ্রে এই যুগলের সাইড প্রোফাইল (প্রায় সব ছবিতে বহুল ব্যবহৃত এই শট সমকামীতার ইঙ্গিতবাহী বা নারীকে উভকামী হিসেবেও চিত্রিত করে। উল্লেখ্য উভকামী নারীত্ব এখানে নারীর যৌন জীবনের ওপর কোনো আলোকপাত নয়, নারীর সমকামীতার ইঙ্গিত এখানে পুরুষের বিনোদন উদ্দেশে পরিবেশিত।)

দ্বিতীয় শট

জুম আউটে দ্রুত স্তন আন্দোলনরত অবস্থায় তারা দুপাশে সরে যেতে থাকে।

তৃতীয় শট

মিড লং-এ এই দুজনের আড়ালে দাঁড়ানোর সংক্ষিপ্ত হাফ প্যান্ট ও উর্ধাঙ্গে অন্তর্বাস পরিহিতা অন্য একটি নারীশরীর স্পষ্ট হয়, যার পেছনে সুবেশী কোট প্যান্ট ও বুকখোলা শার্ট পরিহিত একজন পুরুষ (জমিদার পুত্র) দণ্ডায়মান থাকে।

চতুর্থ শট

মিড লং-এ স্ক্রীনের দুপ্রান্তে নারী ও পুরুষ শরীর দৃশ্যমান-ডান প্রান্তে সম্পূর্ণ পুরুষ-শরীরের সম্মুখ প্রোফাইল এবং বাম প্রান্তে স্ক্রীনের উপর-নীচ জুড়ে নারী শরীরের উর্ধাঙ্গের প্রোফাইল যেখানে এক্সট্রিম ক্লোজআপে শুধুমাত্র স্তনদ্বয় প্রকট।

পঞ্চম শট

তৃতীয় নারীটি কোণাকুণিভাবে ফ্রেমে স্থাপিত। স্ক্রীনে (পা ও মস্তকবিহীনভাবে) শুধু তার নিম্নাঙ্গ, কোমর ও উর্ধাঙ্গ দৃশ্যমান, সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস পরিহিতা এই নারী শরীরের নিম্নাঙ্গে পুরুষটির মুখমন্ডল স্থাপিত।

পীড়নলোভী পুরুষ এখানে প্রকাশ্য থাকে যেখানে নারীত্রয়ের উল্লসিত মুখভঙ্গির বিপরীতে পুরুষটি অত্যন্ত হিংস্র ও সহিংস ভঙ্গিমায় প্রতিটি মুভমেন্ট সম্পন্ন করে। সিকোয়েন্সটিতে নারীর যৌনবস্তুকরণ সম্পন্ন হয় মূলত ক্যামেরা মুভমেন্টের মাধ্যমে।[৪১]

সুচন্দা ও রাজ্জাক : জীবন থেকে নেয়া

চলচ্চিত্রের নারীর অশ্লীল উপস্থাপনা প্রসঙ্গে এক সময়ের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী বর্তমানে সাংসদ কবরী বলেন :

> 'চলচ্চিত্রে আমার আগমন '৬০ এর মাঝামাঝি। আমাদের সময় চলচ্চিত্রে আজকের মতো এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। পারিবারিক গল্প, শহর জীবন, মধ্যবিত্ত জীবন কিংবা গ্রাম অঞ্চলের কাহিনী অথবা ফোক ছবির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত প্রযুক্তির বহুধারাও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বোধ হয় মেয়েদের চরিত্রগুলো বাংলার আদর্শ নারী হিসাবে মূর্ত হয়ে উঠতো ছবির পর্দায়। তাই বলে এটাও ভাবা যায় না নারীদের চরিত্রগুলো '৬০ দশকের বন্ধ দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েছিলো। যুগের পরিবর্তনে মানুষে, প্রকৃতিতে, প্রযুক্তিতে সব কিছুর মধ্যে একটা নতুন হাওয়ার নাচন লেগেছে। তবে এই বসন্তের হাওয়ার ব্যবহার কিভাবে করা হবে সেটাই বিবেচ্য। এক সময় কাপড়ে ফুল তোলা তালপাতার পাখা ছিল, তারপর ইলেক্ট্রিক পাখা এলো। এরপর এসেছে এসি, স্প্লিট। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কিছু আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু এতো কিছুর পরেও মেয়েদের জন্য কী নতুন কিছু আবিষ্কার হয়েছে? শরীর সর্বস্ব পূজার থালায় উপঢৌকন হিসাবে এখনও নারীকে ব্যবহার করা হয়। সেই তুলনায় নারীকে সম্মান দেওয়া হয় না। বস্তাপচা গল্পগুলোকে ভাঙিয়ে কিংবা বম্বের দিলীপ কুমার, রাজ কাপুর, অশোক কুমার, মধুবালা, নার্গিস, বৈজয়ন্তী মালা অভিনীত সেই সময়ের ছবিগুলোকে নকল করে আজকের ছবিতে আধা উলঙ্গ বেঢপ শরীর প্রদর্শন করে একেবারেই অপদার্থ গোছের পরিচালক-অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে ছবি বানিয়ে বরং সেই সব সম্মানিত শিল্পীদের অসম্মান করা হয় (জানিনা-এই পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীরা বিষয়টি আদৌ বোঝেন কিনা!)[৪২]।

চলচ্চিত্রে নারীর বিভিন্ন অবদান

আমরা ইতোমধ্যেই ঢাকার চলচ্চিত্রে নারীর উপস্থাপনের বিষয়ে অর্থাৎ অভিনয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আমরা জানি যে, 'এক সময় আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ও আনন্দ পাওয়ার যে কোন শিক্ষাকেই বাংলার মুসলিম সমাজ-এর রক্ষণশীল লোকেরা কুফুরী কাজ বলে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তার প্রথম ও প্রধান বাধা হয়েছেন নারী। তাদের রঙ্গমঞ্চে বা চলচ্চিত্রে অভিনয় করা দূরে থাক, নাটক বা চলচ্চিত্রে দেখাও পাপ কাজ বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল'[৪৩]।

ঢাকার নারীরা সেই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে শুধু অভিনয়ই করেনি, চলচ্চিত্র পরিচালনা, প্রযোজনা, গান রচনা এবং সঙ্গীত পরিচালনাতেও এগিয়ে এসেছে।

চিত্র পরিচালনা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা স্থানের মতো ঢাকার চলচ্চিত্রের নানা ক্ষেত্রেও (প্রযোজনা, পরিচালনা, পরিবেশনা, সঙ্গীত পরিচালনা, কারিগরি কুশলতা) রয়েছে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য। এখানে ১৯৫৬ থেকে ২০০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৭০০শত মূল ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র ১২/১৩টি চলচ্চিত্র ছাড়া বাদবাকি সবই পুরুষ পরিচালকদের দ্বারা নির্মিত।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে *বিন্দু থেকে বৃত্ত* নামে একটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সেকালের সারা পাকিস্তান তথা ঢাকার চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একজন নারী নির্মাতার নাম সংযোজিত

হয়। তিনি রেবেকা (১৯৪১-২০০৭)। চিত্র পরিচালনার আগে তিনি রাত্রি বায় নামে কয়েকটি ছবিতে (এইতো জীবন, ১৯৬৪, বাহানা-১৯৬৬) অভিনয় করেছেন। তাঁর আসল নাম মনজন আরা বেগম। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সাহসী, উদ্যমী, সচেতন শিক্ষিত রেবেকা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর চাকুরি নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ও পরিচালনায় জড়িত হন। তিনি বলেছেন–

> ছবিতে অভিনয় করতে এসেই আকৃষ্ট হলাম চিত্র পরিচালনার দিকে। রাজ্জাকের অভিনয়কে মনে হতো কৃত্রিম, মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে অবাস্তবভাবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম ছবি পরিচালনা করতে হবে। জীবন ঘনিষ্ঠ ছবি বানাবো এই উদ্দেশ্যেই অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে শিখতে থাকবলাম সম্পাদনা ও ক্যামেরার কাজ। এ ব্যাপারে প্রয়াত চিত্র সম্পাদক বশীর হোসেন, এরশাদ (এখন টিভিতে) এর কাছে আমি ঋণী। আমার চিত্র পরিচালনার পেছনে পরিচালক ফখরুল আলমের অবদান সবচেয়ে বেশি। ... ফখরুল আনামের সহায়তা ও নিজের অর্জিত জ্ঞান দিয়েই আমি বিন্দু থেকে বৃত্ত (১৯৭০) বানিয়েছি[৫৪]।

রেবেকা : সাবেক পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম নারী চলচ্চিত্রকার

বিন্দু থেকে বৃত্ত ছিল ১৯৫৬-১৯৭০ সালের মধ্যে ঢাকায় নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে জীবনধর্মী ও ভিন্নধারার।

এরপর দীর্ঘ বিরতি। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে অভিনেত্রী-প্রযোজিকা রোজী *আশা-নিরাশা* নামে গতানুগতিক ধারার একটি চিত্র পরিচালনা করেন। চিত্র পরিচালনায় তিনি হলেন ঢাকার দ্বিতীয় মহিলা নির্মাতা। পরবর্তীতে চিত্র পরিচালনায় আসেন গীতিকার-অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া (*সিঁদুর নিওনা মুছে*-১৯৮৭) অভিনেত্রী-প্রযোজিকা সুজাতা (*অপর্ণ*-১৯৮৮), নার্গিস আখতার (*মেঘলা আকাশ*-২০০২, *চার সতীনের ঘর*-২০০৫), মৌসুমী (*কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি*-২০০৩, *মেহের নিগার*-২০০৬, যৌথভাবে) অভিনেত্রী-প্রযোজিকা সুচন্দা (*হাজার বছর ধরে*-২০০৬), টিভি সংবাদ পাঠিকা সামিয়া জামান (*রানী কুঠির বাকী ইতিহাস*-২০০৬) এবং অভিনেত্রী ও পরবর্তীকালের সাংসদ কবরী (*আয়না*-২০০৬)।

শামীম আখতার

অন্যদিকে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও বিকল্পধারা এবং উন্নয়ন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কতিপয় শিক্ষিত, সচেতন ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নারী নির্মাতার আবির্ভাব ঘটে ১৯৯০ দশক থেকে। চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, জেন্ডার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা, বিদেশি সংস্থার সহায়তা ইত্যাদি কারণে নতুন প্রজন্মের নারী নির্মাতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারীর সংগ্রাম, মুক্তি, উন্নয়ন, পেশা ও চেতনার ওপর জোর দেয়। তারা পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চিত্রের পাশাপাশি স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র, জীবনীচিত্র, প্রামাণ্য বা তথ্যচিত্র নির্মান করে বিকল্পধারায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে।

একুশ শতকের শুরু থেকে বিভিন্ন বিষয় নির্ভর ও দৃষ্টিকোণ থেকে নারী চিত্র নির্মাতাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের ক্যামেরায় ফুটে ওঠে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নারী নির্যাতন, যৌতুক, গৃহ বা পোশাককর্মীর জীবন অথবা কোন মহিয়সী বা সংগ্রামী নারীর জীবন। কীর্তিমান পুরুষদের প্রামাণ্য জীবনও বিধৃত হয় তাদের ক্যামেরায়।

নিশাত জাহান রানা

এই ধারার নারী নির্মাতাদের মধ্যে রয়েছেন শামীম আখতার (*সে, ইতিহাস কন্যা, শিলালিপি*), নিশাত জাহান রানা (*চেতনায় একুশে: একটি গানের ইতিহাস, ফিনিক্স, পথে পথে দিলাম ছড়াইয়া* (কলিম শরাফী), *মাস্টার মশাই* (সন্তোষ গুপ্ত) *অসামান্য*), রেশমি আহমদ (দীপান্বিতা, সফদারের মিনিট ক্যামেরা), রোকেয়া প্রাচী[৪৫] ফওজিয়া খান (*আমাকে বলতে দাও, যেতে হবে বহুদূর, অভিযাত্রিক, অন্য আকাশ*), শবনম ফেরদৌসী (*জীবনের সন্ধানে, নহ মাতা নহ কন্যা*), নাসরীন সিরাজ এ্যানি (*নারীর চোখে মাতৃত্ব*), লুৎফুন্নাহার মৌসুমী (অন্যযোদ্ধা), নিগার (শিল্পী), সামিরা হক, উম্মুল খায়ের ফাতেমা, ফারজানা রূপা, খালেদা আখতার রোজী, মোসফেকা আলম, ক্যামেলিয়া[৪৬]। এঁরা সবাই ভিডিও ফরম্যাটে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

চিত্র প্রযোজনা

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যারা পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকেন তারই প্রযোজক নামে পরিচিত। চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগ ছাড়া আরো অনেক কিছু জড়িত থাকে। প্রযোজকের কাছে চলচ্চিত্র হচেছ বাণিজ্যিক পণ্য যাকে সোনার রাজহাঁস বলা যেতে পারে। প্রযোজকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিনিযোগকৃত পুঁজি ফেরতসহ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন।

চলচ্চিত্র প্রযোজনা এককভবে বা যৌতভাবে হতে পারে। প্রযোজকরা চলচ্চিত্রের কাহিনী ও নাম নির্ধারণ, পরিচালক-শিল্পী-কলাকুশলী নিয়োগ, শুটিং ডাবিং, রেকর্ডিং, এডিটিং, সেন্সর সনদ ও হলে মুক্তির ব্যবস্থা এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। একটি চলচ্চিত্রের মূল মালিক প্রযোজক।

নানা কারণে চলচ্চিত্রে পুঁজি বিনিয়োগ ও প্রযোজনার ব্যাপারে অন্যান্য চলচ্চিত্রিক কাজকর্মের মতো এ ক্ষেত্রেও পুরুষের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্বে যেমন- *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬), *আকাশ আর মাটি* (১৯৫৯), *মাটির পাহাড়* (১৯৫৯), *এদেশ তোমার আমার* (১৯৫৯), *রাজধানীর বুকে* (১৯৬০), *কখনো আসেনি* (১৯৬১), *সূর্যস্নান* (১৯৬২) প্রভৃতি চিত্রের সঙ্গে কোনা মহিলা প্রযোজক জড়িত ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত স্বামী বা নিকট আত্মীয়দের সহায়তায় নারীরা চলচ্চিত্র প্রযোজনায় জড়িত হন। ঢাকার চলচ্চিত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমী ও শুভ লক্ষণ যে রক্ষণশীল সমাজের কঠোরতা ভেঙ্গে মুসলিম নারীরা চলচ্চিত্রে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়েছে।

এফডিসির বিভিন্ন নথি ও অন্যান্য সূত্র অনসন্ধান করে প্রথমবারের মতো জানা গেছে বেশ ক'জন অগ্রণী মহিলা চিত্র প্রযোজকের নাম। ১৯৫০ দশকে ঢাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী চিত্র প্রতিষ্ঠান স্টার ফিল্মস করপোরেশন আদিতে ছিল পরিবেশনা সংস্থা। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে এটি কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা শুরু করে। ওই সময় এই প্রতিষ্ঠানের ৭জন অংশীদারের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন নারী। এঁরা ছিলেন জরিনা বাকীর, খোরশেদী আলম, রওশন আরা বেগম ও নাজনীন

রওশনালী। এদের প্রযোজনায় নির্মিত হয় *কাজল* (১৯৬৫), *বেহুলা* (১৯৬৬), *আনোয়ারা* (১৯৬৭) প্রভৃতি চিত্র। এছাড়াও আরো অনেক ছবিতে তারা নেপথ্য প্রযোজক হিসেবে অর্থ প্রদান করেন[৪৭]।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত *হারানো দিন* চিত্রের ৪জন প্রযোজকের মধ্যে একজন ছিলেন নারী- তার নাম ওয়ালিয়া মেহেদী হাসান। এই চিত্রটি নির্মিত হয়েছিল মিনার ফিল্মসের ব্যানারে[৪৮]। ঢাকার প্রথম সবাক বাংলা কাহিনীচিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) এর প্রযোজনা সংস্থা ইকবাল ফিল্মস লিঃ আদিতে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সেটি ঢাকায় ১৯৫২-৫৩ খ্রীস্টাব্দে একবার এবং ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার পুনর্গঠিত হয়। সর্বশেষ পুনর্গঠিত ইকবাল ফিল্মস লিঃ কোম্পানীর ৪জন অংশীদারের মধ্যে একজন ছিলেন নারী-নাম জাহানারা বেগম। এদের প্রযোজনায় নির্মিত হয় *জোয়ার এলো* (১৯৬২), *উজালা* (১৯৬৬), *পরওয়াণা* (১৯৬৬) প্রভৃতি চিত্র[৪৯]।

১৯৬০ দশকে ঢাকার নিউ অজন্তা ফিল্ম করপোরেশন নামে আরেকটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ১১জন অংশীদারের মধ্যে ৩জন নারী ছিলেন। এঁদের নাম- হাসিনা আহমদ, শামসুন্নাহার ও পিয়ারা বানু হাকিম[৫০]। গায়িকা মাহবুবা রহমান স্বামী গীতিকার গায়ক-পরিচালক খান আতাউর রহমানের সহায়তায় চিত্র প্রযোজনায় জড়িত হন সেভেন আর্টস লিমিটেড-এর মাধ্যমে। তিনি *অনেকদিনের চেনা* (১৯৬৪) ও অন্যান্য চিত্র প্রযোজনা করেন[৫১]।

ঢাকার চলচ্চিত্রে প্রযোজনায় যে নারী প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি অভিনেত্রী সুমিতা দেবী (১৯৩৬-২০০৪)। তার নিজের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল মিতা ফিল্মস। তার প্রযোজনায় তৈরি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বেশ ক'জন নতুন পরিচালক ও শিল্প-কুশলীর আবির্ভাব ঘটেছে। সুমিতা প্রযোজিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *আগুন নিয়ে খেলা* (১৯৬৬), *মোমের আলো* (১৯৬৮), *মায়ার সংসার* (১৯৬৯), *আদর্শ ছাপাখানা* (১৯৭০), *নতুন প্রভাত* (১৯৭০) ও *স্বল্পদৈর্ঘ্যচিত্র দেয়াল* (১৯৮৯)[৫২]।

নীলুফার খায়ের প্রযোজনায় রুমা কথাচিত্রের ব্যানারে কাগজের নৌকা (১৯৬৬) তৈরি হয়। অভিনেত্রী সুমিতার পর চিত্র প্রযোজিকা হিসেবে অভিনেত্রী সুলতানা জামান (*ছদ্মবেশী, ভানমুতীর খেলা*), শাবানা (*মুক্তি, মাটির ঘর, মান-সম্মান, নাজমা*), সুজাতা (*চেনা-অচেনা, রূপবানের রূপকথা, সূর্য ওঠার আগে, এখানে আকাশ নীল*), কবরী (*হীরামন, গুন্ডা*), চিত্রা জহির, ববিতা (*ফুলশয্যা, চন্ডিদাস ও রজকিনী, পোকা মাকড়ের ঘর বসতি*), সুচন্দা (*তিনকন্যা, হাজার বছর ধরে*), মঞ্জু দত্ত, সুরাইয়া চৌধুরী, নূতন, রোজিনা, দুলারী প্রমুখ আবির্ভূত হন। চিত্রকর্মী স্বামীদের সঙ্গে প্রযোজক হিসেবে নাম পাওয়া যায় জোহরা গাজী, রমলা সাহা, গায়তী বিশ্বাস, বদরুন্নাহার প্রমুখের।

নারীবাদী চলচ্চিত্রকার নার্গিস আখতারও চিত্র প্রযোজনা করেন কয়েকটি। যেমন *মেঘলা আকাশ, চার সতীনের ঘর, মেঘের কোলে রোদ* প্রভৃতি।

ঢাকার চলচ্চিত্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা প্রযোজকদের সংখ্যাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির

ভোটার সদস্য হিসেবে ২২ জন মহিলা প্রযোজকের নাম পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, সমিতির মোট ভোটার সদস্য সংখ্যা ২২০ জন[৫৩]।

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও গান রচনা

ঢাকার চলচ্চিত্রে বেশ ক'জন নারীকে পাওয়া যায় চলচ্চিত্রের কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপকার ও গীতিকার হিসেবে। এঁদের মধ্যে কাহিনীকার হিসেবে রয়েছেন নীলুফার খায়ের (*সুতরাং*), রোমেনা আফাজ (*কাগজের নৌকা*), দিলারা হাশেম (*বলাকা মন*), রাবেয়া খাতুন (*সান অব পাকিস্তান, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি, মেঘের পরে মেঘ, ধ্রুবতারা*), সেলিনা হোসেন (*চার সতীনের ঘর, পোকা মাকড়ের ঘর বসতি, হাঙর নদী গ্রেনেড, মেঘলা আকাশ*), মকবুলা মঞ্জুর (*ডানপিটে ছেলে*) প্রমুখ।

চিত্রনাট্যকার হিসেবে নারীদের সংখ্যা খুবই সীমিত। এদের মধ্যে রয়েছেন কবরী (*আয়না*), নার্গিস আখতার (*মেঘলা আকাশ, চার সতীনের ঘর*), সুচন্দা (*হাজার বছর ধরে, মৌসুমী*), শামীম আখতার, নিশাত জাহান রানা, ফওজিয়া খান, শবনম ফেরদৌসী, ফারজানা রূপা প্রমুখ।

চলচ্চিত্রের গান রচনায় পুরুষের আধিপত্য অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই সরব ও একচেটিয়া। বেতার ও টেলিভিশনে অনেক মহিলা গীতিকার থাকলেও পরিবেশগত কারণে চলচ্চিত্রে মহিলা গীতিকার নেই বললেই চলে। কিন্তু তবুও চলচ্চিত্রে গান লিখে সুনাম অর্জন করেছেন লতিফা জিলানী, জাহানারা ভূঁইয়া, সামিয়া জামান।

সংগীত পরিচালনা

ঢাকার ছবিতে সেই *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) থেকে মহিলা শিল্পীরা সংগীতে কণ্ঠদান করলেও ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় তাদের সুযোগ হয়নি। বিষয়টি যেমন দক্ষতাগত তেমন পরিবেশ ও দৃষ্টিভঙ্গীগতও। এক্ষেত্রেও পুরুষরাই আধিপত্য করছে। চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় মাত্র দু'জন নারীকে পাওয়া যায়। এরা হলেন ফেরদৌসী রহমান (*রাজধানীর বুকে-যৌথভাবে, ও মেঘের অনেক রং*) এবং শিমুল ইউসুফ (*আগামী, সূচনা, কীর্তণখোলা ও একাত্তরের যীশু*)।

সঙ্গীতে কণ্ঠদান

ঢাকার চলচ্চিত্রে সংগীতের কণ্ঠদানে নারীরা এগিয়ে রয়েছেন পুরুষের পাশাপাশি সেই প্রথম চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* (১৯৫৬) থেকেই। ওই ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন মাহবুবা রহমান। পরবর্তীকালে তিনি আরো অনেক ছবির গানে কণ্ঠ দেন। যেমন-*যে নদী মরূপথে, কখনো আসেনি, সোনার কাজল, সাতভাই চম্পা।* এফডিসি-র প্রথম চিত্র *আসিয়া*'য় (১৯৫৭-১৯৬০) কণ্ঠ দেন ফেরদৌসী রহমান। পরে তিনি ১৯৬০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা ও উর্দু ছবির গানে কণ্ঠ দানে আধিপত্য বজায় রাখেন। যেমন-*এদেশ তোমার আমর, হারানো দিন, সূর্যস্নান, চান্দা, জোয়ার এলো, তালাশ, এইতো*

জীবন, সুতরাং, বন্ধন প্রভৃতি। *আসিয়া*'য় আরো কয়েকজন গায়িকা কণ্ঠ দেন। যথা- হুসনা বানু খানম, রওশন আরা, শামসুন্নাহার করিম ও হাজেরা বিবি।

ঢাকার বিভিন্ন চলচ্চিত্রে গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু, আঞ্জুমান আরা, ফরিদা ইয়াসমিন, ফওজিয়া ইয়াসমীণ, সাবিনা ইয়াসমিন, শাহনাজ রহমতুল্লাহ, আলেয়া শারাফী, রুনা লায়লা, আবিদা সুলতানা, কনক চাঁপা, বেবী নাজনীন প্রমুখ। চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার ১৯৭৫ সালে এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) এর সম্মাননা ও পুরস্কার ১৯৭২-৭৩ সালে চালু হয়। এর ফলে নারী শিল্পীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কারিগরি কুশলতা : চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা

ঢাকার ১৯৫৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত প্রায় ২৭০০ পূর্ণদৈর্ঘ্য ও কাহিনীচিত্র নির্মিত হলেও চলচ্চিত্র নির্মাণের মূল যে প্রযুক্তিগত কৌশল চিত্রগ্রহণ - সেখানে কোনো নারীর উপস্থিতি নেই। প্রযুক্তিনির্ভর ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় আলোকচিত্রী হিসেবে এই মাধ্যমটির আবিস্কার, আবির্ভাব পর্বেও বিজ্ঞানীরা 'ক্যামেরা ওম্যান' শব্দটি চালু করেননি। তবে বাংলাদেশে ১৯৯০ দশকে ভিডিও পদ্ধতিতে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের কয়েকজন সাহসী তরুণী ভিডিও ক্যামেরার কাজ শিখেন এবং এই পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেন ব্যক্তিগত বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। তবে এক্ষেত্রে ভিডিও আলোকচিত্রীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। যারা কাজ শিখেছেন তারা বিভিন্ন এনজিও বা টিভি চ্যানেলেই চাকুরি করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সামিয়া হক, রেশমি আহমদ প্রমুখ।

চলচ্চিত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে যিনি ঢাকার চিত্রাঙ্গণে পথিকৃৎ হয়ে আছেন তিনি ফওজিয়া খান। ভারতের পুনা ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে চিত্র সম্পাদনায় প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি স্বপরিচালিত চিত্রের সম্পাদনা ও অন্যের ছবির কাজও করেছেন। তাঁর সম্পাদিত ছবির মধ্যে রয়েছে- *আমাকে বলতে দাও* (২০০৫-২০০৬), *যেতে হবে বহুদূর* (২০০৪), *নহ মাতা নহ কন্যা* (২০০০-২০০১), *অভিযাত্রিক* (২০০১), *অন্য অনুভব* (১৯৯৯)।

ভিডিওচিত্র সম্পাদক হিসেবে লুৎফুন্নাহার মৌসুমীও কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছেন (ইন কোয়েস্ট অব লাইফ-২০০৪-২০০৫, নারীর চোখে মাতৃত্ব-২০০৪-২০০৫, সাজ শিল্পী-২০০৪-২০০৫)[৫৪]।

চিত্র সম্পাদক হিসেবে ঢাকার চলচ্চিত্রাঙ্গনে দুজন বিদেশিনীর রয়েছে বিশেষ কৃতিত্ব। এদের একজন মিসেস বিনোভোবেট ফ্লেচার (বৃটিশ), *জাগো হুয়া সাভেরা* (১৯৫৯) চিত্রের সম্পাদক হিসেবে কিংবদন্তি হয়ে আছেন[৫৫]। ১৯৯০ দশকে ক্যাথেরিন মাসুদ (মার্কিন/বাংলাদেশী) তারেক মাসুদের সঙ্গে চিত্র পরিচালনা ও সম্পাদনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার সম্পাদিত চিত্রের মধ্যে রয়েছে *মুক্তির গান* (১৯৯৫), *মুক্তির কথা* (১৯৯০), *মাটির ময়না* (২০০২), *নরসুন্দর* (২০০৯)।

নৃত্য পরিচালনা

ঢাকার চলচ্চিত্রে মহিলা শিল্পীদের নাচের আধিক্য থাকলেও সেক্ষেত্রে নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বটি পুরুষরাই নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে মহিলা নৃত্য পরিচালকের তীব্র অভাবটাই যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়। আসল কথা সুযোগ দেয়া হয় না মহিলা পরিচালকদের। তবে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ লগ্নে ১৯৬০ দশকেই চলচ্চিত্রের নৃত্য পরিচালনায় অগ্রপথিক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন রাফিয়া মনসুর। প্রখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা আলী মনসুরের সহায়তায় তিনি চলচ্চিত্রে নৃত্য পরিচালনা করেন। তাঁর নৃত্য পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে *জানাজানি* (১৯৬৫), *নবাব সিরাজদ্দৌলা* (১৯৬৭), *মহুয়া* (১৯৬৮)। ফ্লোরা আউয়াল নামে আরেকজন নারীও নৃত্য পরিচালনায় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন *অন্তরঙ্গ* (১৯৭০) ছবিতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শীলা মমতাজ (*কুসুমকলি*) ও নাগমা মান্নান এ দুজনকে পাওয়া যায় ছায়াছবিতে নৃত্য পরিচালক হিসেবে[৫৬]।

অন্যদিকে বিশিষ্ট অভিনেত্রী-পরিচালক কবরী (আয়না), সুচন্দা (হাজার বছর ধরে) তাদের ছবিতে সুদক্ষ নৃত্য পরিচালকদের পাশাপাশি নিজেরাও নৃত্য পরিচালনা করেছেন। নার্গিস আখতারও তাঁর ছবির দু'একটি নৃত্য পরিচালনা করেছেন।

চলচ্চিত্র দেখা

ঢাকায় চলচ্চিত্রের আবির্ভাব পর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি (১৮৯৮-২০০৯) চলচ্চিত্র অবলোকন বা দেখার ক্ষেত্রে দর্শক হিসেবে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নানা কারণে নারীদের চলচ্চিত্র দেখার বিষয়টি চাপা পড়ে রয়েছে। তবে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন সূত্রে (স্মৃতিকথা, জীবনকথা, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, চিঠিপত্র) তাতে দেখা যায় নারীরা সেকালে ধর্মীয় এবং সামাজিক বেষ্টনী উপেক্ষা করে চলচ্চিত্র দেখে বিনোদিত হয়ে সামাজিকায়ন ও বাণিজ্যায়নে সহায়তা করেছেন। তারা চলচ্চিত্রের কাহিনী, বিষয়বস্তু, পরিবেশ-পরিস্থিতি, চরিত্রের সুখ-দুঃখ দেখে আবেগ-আপ্লুত হয়েছেন। পাত্র-পাত্রীদের পোষাক, কথাবার্তা, স্টাইল, আচরণ অনুসরন করেছেন। ঢাকার আদি নারী দর্শকদের মধ্যে নওয়াব পরিবারের সদস্যরা ছিলেন ভাগ্যবতী। ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে নওয়াব আহসানউল্লাহর আমন্ত্রণে আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে বায়োস্কোপ দেখানো হয়। সহজেই অনুমেয় যে ওই প্রদর্শনীতে নওয়াব পরিবারের মহিলারাও দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আহসান মঞ্জিলে ১৯১১ সালের মার্চ মাসেও বায়োস্কোপ দেখানো হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে নওয়াব বাড়ির মহিলা দর্শকরাও ছিলেন। ১৯১১ সালের ২৪ মার্চ রাতে খাজা আব্দুল আলীমের বাসায়ও বায়োস্কোপ দেখানো হয়। এতেও নারী দর্শকও ছিল। ২৫ মার্চ খাজা আতিকুল্লার বাসায়ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়[৫৭]। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, একটি পরিবারের মধ্যে চলচ্চিত্র দেখার জন্য আবহ তৈরি করেছেন নারীরা। নারী দর্শকদের কথা চিন্তা করেই হলে নারীদের জন্য আলাদা আসন ও টিকেটের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে

সেকালের একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ১৯০২ সালের ১২ মে তারিখে বায়োস্কোপ দেখানো হয়। ঐ বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 'স্ত্রীলোকের' জন আলাদা আসন ও প্রবেশ পত্রের ব্যবস্থা রাখা হয় বলে বিজ্ঞাপনে লেখা হয় :

'স্ত্রীলোকের গ্যালারি টিকেট আট আনা দেখিয়া যাইবেন, নচেৎ আক্ষেপ করিবেন'[৫৮]।

আরেকটি মজার তথ্য পাওয়া যায় মায়ের সঙ্গে কোলে চড়ে বা আঁচল ধরেও শৈশব-কৈশোরে চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতার। এমন একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় ১৯০২-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) কর্তৃক ঢাকার অদূরে তাঁর গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের বকজুরীস্থ নাট্যশালায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে। ওই গ্রামের হীরালালের পড়শি শিশির কুমার গুপ্ত ৫/৬ বছর বয়সে মায়ের আঁচল ধরে বায়োস্কোপ দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন[৫৯]।

আগেই উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, ঢাকার নওয়াব তথা খাজা পরিবারের অনেক মেয়েরাও বায়োস্কোপের আদি পর্বের দর্শক ছিলেন। খাজা মওদুদ ১৯১৬ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার একটি হলে রাতের শো'তে তার বড় ভাবীকে নিয়ে ছবি দেখেন[৬০]। খাজা হুমায়ুন কাদেরের স্ত্রীও ১৯১৬ সালের ২০ জুন রাতে ছবি দেখেন[৬১]। নওয়াব খাজা আতিকুল্লাহর স্ত্রীও স্বামী-পুত্র নিয়ে ছবি দেখেন ১৯১৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়[৬২]।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত (১৯১১-১৯৯৭) ঢাকায় আসেন ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। কলেজিয়েট স্কুল ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। তার বর্ণনায়ও রয়েছে ঢাকার একমাত্র সিনেমা হল আরমানীটোলাস্থ পিকচার হাউজে (শাবিস্তান) দল বেঁধে মেয়েদের ছবি দেখা সম্পর্কে তথ্য। তিনি লিখেছেন,

> 'উৎসাহের জোয়ার উঠতো বাংলা টাইটেল দেওয়া ছবি দেখানো হলে। শহরের সব পাড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে আশেপাশের গ্রাম থেকে, এ পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে ও পাড়া হইতে আয় খেয়া দিয়ে অগুণতি লোক আসতো কমলে কামিনী বা 'পতিভক্তি' দেখতে'[৬৩]।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতি অনুরাগী যোবায়দা মির্যা ঢাকায় ত্রিশের দশকে অনেক চলচ্চিত্র দেখেছেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। তাঁর দেখা ছবির বিবরণ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায় অনেক কিছু। তিনি লিখেছেন :

> 'আমাদের ছেলেবেলায়, অর্থাৎ আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন মুসলমান মেয়েদের সিনেমা দেখার সুযোগ বিশেষ ছিল না। তার প্রধান কারণ পর্দার কড়াকড়ি। হয়তো কদাচিৎ দু'একটি মেয়ে যেতো ছবি দেখতে, তাদের বিয়ের পরে, ঘোড়া-গাড়ির জানালার সব কটা খড়খড়ি তুলে বন্ধ করে। তখন আর তারা মেয়ে নয়, বৌ-কিন্তু-বৌরা ক'দিনই বা নতুন থাকে! নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি, পুরোন হলেই বাতায় গুজি'। তারা যা দেখতো তাকে বলতো বায়োস্কোপ, সিনেমা নয়।
>
> ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় সিনেমা হল ছিল মাত্র দুটি– মুকুল আর মোতিমহল। সে সময় ছবি ছিল নির্বাক। ক্রমশ সবাক চিত্র এলো। তখন মুকুলের নাম হলো 'মুকুল টকিজ'। সেই মুকুল এখনো আছে। ... মোতিমহলে সরকারি

প্রচারণাভিত্তিক বায়োস্কোপ দেখাতো। বিষয় কলেরা, বসন্ত, মশা, মাছি, যক্ষ্মা ইত্যাদি। সেসব ভালো করে মনে নেই, কারণ কথা তো শুনতে পেতাম না। পর্দার ওপর লিখে দিতো বটে, কিন্তু সে লেখাগুলো এমন ঝটপট পাল্টে যেতো সাধ্য কার যে পড়ে! শুধু দ্রুত পরিবর্তনশীল চলমান ছবি দেখে যেটুকু বুঝতাম তাই কি আর এতদিন মনে থাকে! তবু একটা দুটো মনে আছে। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটা ছবিতে দেখেছিলাম– কাঁচা পায়খানায় অসংখ্য মাছি ভিন্ ভিন্ করে বসছে আবার সেখান থেকে উড়ে এসে সোজা বসছে মিষ্টিওয়ালার দোকানের খোলা খাবারের ওপর। দোকানের কারিগর রসগোল্লা, পান্তুয়া, লালমোহন, আমৃত্তি বানিয়ে প্রকাণ্ড থালায় স্তূপ করে সাজিয়ে সারি সারি রাখছে একটা টেবিলের উপর– ঢাকাঢাকির বালাই নেই। গ্রাহকের ঠেলাঠেলি– সেসব খাবার নিশ্চিন্ত মনে কিনে খাচ্ছে সবাই। সবচেয়ে মজা লেগেছিল জিলিপি ভাজার দৃশ্যটা। গনগণে চুলোয় ইয়া বড় কড়াইতে প্রায় কানায় কানায় ভর্তি তেল ফুটছে টগবগিয়ে, একটা ফুটো মালাইয়ে জিলিপির গোলা নিয়ে নিপুণভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কড়াইয়ে ফেলছে কারিগর। ঐ প্যাঁচানোর ভঙ্গিটাই চমৎকার। একেতো কষ্টিপাথরে কুদে তোলা কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ গড়ন তার আবার মালকোঁচা এঁটেছে ধবধবে সাদা ধুতিতে, মাথায় জড়ানো একটা লাল গামছা, খালি গা। হাত যত বেগে ঘুরছে তার চেয়ে বেশি বেশি গতিতে দুলছে তার মাজা– অপূর্ব সেই ভঙ্গি দেখে চারদিকে সবাই হেসে গড়াগড়ি।.....

তিরিশের দশকের প্রথম দিকে মুকুল আর মোতিমহল বেশ জোরেসোরেই চলছিল। তারপর মুকুলের কর্তৃপক্ষ মোতিমহলটা কিনে নিয়ে তার নাম রাখলো রূপমহল, যে নামে আজও চলছে। ইসলামপুর এলাকায় লায়ন সিনেমায় ব্যবসা বেশ জেঁকে উঠলো– এখানে বাংলা ছবি নয়, বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবিই বেশি দেখানো হতো। তাতে উত্তেজক নাচ-গান, মারপিট এতই জনপ্রিয় যে দর্শক আর ধরে না। এখানে খেটে-খাওয়া মানুষের ভীড়। অত্যন্ত ঘিঞ্জি গলির মধ্যে অবস্থান নিয়েও এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। এখনও এর জনপ্রিয়তা অব্যাহত আছে। আরও একটি বড় সিনেমা হল আরমানিটোলা আনন্দময়ী স্কুলের উল্টোদিকে। এটি এখনও টিকে আছে। ব্রিটানিয়া টকিজ নামে ছোট্ট একটি সিনেমা হল, এখন যেখানটায় জেনারেল পোস্ট অফিস ঠিক সেখানটায় ছিল। এখানে শুধু ইংরেজি ছবি দেখানো হতো। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকেই এটা উঠে গেছে। মানসী ও প্যারাডাইস নামে দুটি সিনেমাহল হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। মোটামুটিভাবে ঢাকায় এই কটি মাত্র সিনেমা হল আমার জানামতে।

সমসাময়িক মেয়েদের মধ্যে সিনেমা দেখার সৌভাগ্য বলতে হবে আমার অতি সুপ্রসন্ন। তখনকার দিকে শিক্ষিত লোকেরা একটু উন্নাসিক ছিল এ বিষয়ে। তাদের ধারণা, সিনেমা? সিনেমা কি ভদ্দরলোকে দেখে নাকি? ওসব দেখে কারা? অশিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিতরা আর মফঃস্বল শহর কিংবা গণ্ডগ্রাম থেকে যারা বিশেষ করে বায়োস্কোপ দেখার জন্যেই ঢাকায় আসে তারা। আবার বাবা-মারও প্রায় ঐরকমই অভিমত ছিল- অত সিনেমা দেখলে ছেলেপিলে ফক্কড় হয়ে যায়।

শুধু মুসলমান পরিবারেই নয়, হিন্দু পরিবারেও এমনি গোঁড়ামি ছিল বিভিন্ন কারণে। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল রমলাদের বাড়িতে পারিবারিক পর্যায়ে আসা-যাওয়া ছিল।

ওর মা বলতেন, 'ছেলেমেয়ে নিয়ে সিনেমায় যাবো কেন! সিনেমা দেখবো আমরা শুধু স্বামী-স্ত্রী।' অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের চক্র আলাদা- তারা যাবে বিয়ের পরে নিজেদের সংসার হলে। এত কড়াকড়ির মধ্যে থেকেও আমরা জীবনে মাত্র একবার এমনি মহাযাত্রা করেছিলাম। বড় মামা বৌ নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে। তাঁদের সম্মানে আমরা তিন ঘোড়াগাড়ি বোঝাই হয়ে গিয়েছি মুকুলে শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' দেখতে। এর প্রত্যেকটি দৃশ্য এবং সংলাপ আমার মনে আজ পর্যন্ত জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে আছে। এটি আমার জীবনের চতুর্থ সবাক চিত্র'.....

ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি ছবি দেখেছি প্রচুর, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি, বিয়ের পরে– তার আগে অনুমতি ছিল না। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করে শেষ করি। আমার কর্তা এক ছুটিতে ঢাকায় এসে প্রস্তাব দিলেন সব শ্যালক-শ্যালিকা সুদ্ধ সিনেমা দেখার। বাবা-মাকে রাজি করানো মুশকিল। বলেন, 'ওরা সিনেমার কি বোঝে!' তখন সবচেয়ে ছোটটি ছিল এক বছরের, তার বড়টি তিন, তার বড়টি পাঁচ.... অনেক জেদাজিদি করে শেষের দুটিকে বাদ দিয়ে পাঁচ বছরের নূরু পর্যন্ত পারমিশন মিললো। দলবল নিয়ে আমরা গেলাম রূপমহলে। সেখানে ছবি চলছিল 'দিদি'। প্রধান চরিত্রে সয়গল, চন্দ্রাবতী, শীলা। শুধু নুরু কেন তার ওপরের সুলতান আর নবাবের জীবনেও এটাই প্রথম ছবি। এদের আগের তিনটি বোন ক'দিন হয় স্কুল থেকে পিকচার হাউসে A Tale of Two Cities দেখে এসেছে, নইলে ওদেরও এটা প্রথম ছবি হতো। স্কুলের দায়িত্বে যাচ্ছে বলেই বাবা-মা আপত্তি করেননি। ...[৬৪]

অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের আরেক কন্যা বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদ ড. সনজিদা খাতুনের দেখা চলচ্চিত্রের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো।

'খুব ছোটবেলার স্মৃতিতে, বয়স যখন ছিল ৫/৬ তখন সেগুনবাগানের বাড়িতে থাকি, মনে পড়ছে, আবছা মনে পড়ছে, ঘোড়ার গাড়িতে চরে আব্বু, আম্মু তাদের বড় মেয়ে ও মেজ মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় গেলেন। আমরা সব দর্শক। সিনেমা কি কিছুই বুঝি না, ঝাপসা স্মৃতিতে আছে যে, সেগুনবাগানে থাকতে বড়দিরা সিনেমায় গিয়েছিলেন। ... বড়দি'র (যোবায়দা মির্জা) তখন বিয়ে হয়ে গেছে। দুলাভাই এসেছেন বাড়িতে, তিনি আমাদের সবাইকে ঘোড়াগাড়িতে বোঝাই করে মুকুল সিনেমায় নিয়ে গেলেন। মুকুল সিনেমা তখন ছিল সদরঘাটে কোর্ট বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে, এখন সেই মুকুল সিনেমার 'আজাদ' নাম হয়েছে। তো তখন মুকুল-এ চলছিল 'দম্পত্তি' নামে একটি ছবি। কিন্তু সে হলে টিকেট পাওয়া গেল না। দুলাভাই তো মহা অপমানিত হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি আমাদের নিয়ে ঘোড়াগাড়িতে করে ঘুরতে ঘুরতে সম্ভবত জেলখানার কাছাকাছি একটি এলাকায় বোধ হয় তাজমহল নামে একটি সিনেমা হল ছিল, সেখানে গেলেন। পরে এই হল আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। সে হলে 'ফরিয়াদ' নামে একটি ছবি চলছিল। সেটিই দেখলাম সেদিন। উর্দু বা হিন্দি– ঠিক কোন ভাষায় ছিল এখন মনে নেই। তখন ১৯৪৫ কি '৪৬ সাল হবে, সম্ভবত ক্লাস সেভেনে পড়ি।

বাবা এক সময় মুকুল আর রূপমহল– এ দুটি সিনেমা হলের শেয়ার কিনেছিলেন। কি কারণে কিনেছিলেন জানি না, যদিও সিনেমা-টিনেমার ব্যাপারে তাকে কখনো আগ্রহী হতে দেখিনি। শেয়ার ছিল বলে আব্বু ছবি দেখার পাস পেতেন, তখন এগুলোকে বলা

তো পারমিট। তো অনেক বলে কয়ে আব্বুকে সিনেমায় যাওয়ার সেই পারমিট নিতে রাজি করতেন বড়রা, তারপর সিনেমায় যাওয়া হতো আমাদের। এভাবে একসময় 'জীবন-মরণ' নামে একটি ছবি দেখেছিলাম। তাতে সায়গল অভিনয় করেছিলেন। তখন দেখা আরেকটি ছবির নাম মনে আছে– *সমাধান*। রবিন মজুমদার ও সন্ধ্যা রাণী অভিনয় করেছিলেন এতে। দুটো ছবিই বেশ ভালো লেগেছিল।

জীবন-মরণ ছবিটি বড় দুলাভাইয়ের সাথে গিয়ে আরেকবার দেখেছিলাম। তখন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। ছবি দেখতে দেখতে আমরা ছোট ভাই নুরু হঠাৎ বললো, পানি খাবো। হলের ভেতর পানি পাবেন কোথায়– কিন্তু দুলাভাই বললেন, একটু অপেক্ষা করো পানি আসছে। একটু পরই পর্দায় একটি দৃশ্যে দেখা গেলো সায়গল পানি বা সোডা খাচ্ছেন। দুলাভাই বললেন, ওইতো পানি। শুনে সবার মুখে হাসি ফুটলো।

সে সময় *উদয়ের পথে* নামে একটি ছবি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। আমার মেজ মামা কলকাতা থেকে এসেছিলেন একবার, তিনি বললেন, *উদয়ের পথে* খুব ভালো ছবি, শিক্ষামূলক ছবি। জ্যোতির্ময় রায় ও বিনতা রায় ছিলেন সে ছবির শিল্পী, খুব আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখেছিলাম। ছবিতে সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা ছিল, গানগুলোও বেশ ভালো লেগেছিল।

আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন নিয়ম ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের দল বেঁধে সিনেমা দেখতে নিয়ে যাওয়ার। সেভাবে দলবলে গিয়ে একটি ছবি দেখেছিলাম, নাম *এ টেল অব টু সিটিজ*। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে তৈরি *পরিণীতা* ছবিটিও তখন দেখেছিলাম। ছবির নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা রানী।

ইডেন কলেজে পড়ার সময় আমাদের বাসার নিচতলায় মিসেস জোহা নামে এক মহিলা থাকতেন। আমরা তাকে রাঙাদি বলে ডাকতাম। তার ছিল সিনেমা দেখার বাতিক। দুপুর বেলায় তিনি সিনেমা দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। তার সঙ্গী হয়ে মাঝে মধ্যে আমরা কেউ কেউ যেতাম। আমি বার দুয়েক গিয়েছি তার সাথে। তিনি বেশি দেখতেন হিন্দি ছবি। তার সাথে দেখেছিলাম *দোস্ত* নামে এক ছবি। খুব মারপিট ছিল সে ছবিতে।

পরবর্তীকালে দেখা ছবির মধ্যে আমার এখনো মনে আছে *মাটির পাহাড়* ছবির কথা। এ ছবিতে বোবা মেয়ের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিল রওশন আরা নামে একটি মেয়ে, অপূর্ব লেগেছিল তার অভিনয়। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।[৬৫]

পুরানো ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের (জন্ম ১৯৩৫) স্মৃতিকথায়ও। রূপমহলে ছবি দেখা সম্পর্কে তার বর্ণনা :

"সব রোববার বিকেলের চেহারা এক রকম ছিল না। কোনো কোনো দিন মাধুর্য বাড়তো। সেদিন পায়ে হেঁটে নয়, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আসতাম। সঙ্গে মা, বাবা। রূপমহলে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছি। দুপাশে জানালা বন্ধ, গাড়ির দরোজা খুলে যেতেই হলের ঝি নেমে আসতো মেয়ে ক্লাসের সিঁড়ি ভেঙে। রাস্তা পর্যন্ত দুদিকে টেনে দিতো কালো পর্দা। এর ভেতর দিয়ে মা-চাচীরা উঠে যেতেন মহিলা সংরক্ষিত স্থানে। নিচে পুরুষদের মতো ওপরে মেয়েদেরও শ্রেণী বিভক্ত আসন। একতলা হলের (যেমন পিকচার হাউস) ভেতরেও পর্দার ব্যবস্থা ছিল। ছবি শুরু হলে ঝি পর্দা সরিয়ে দিতো।... সিনেমা হলের মঞ্চে ঝুলতো চকচকে নকশাদার সার্টিনের পর্দা। দু'ধারের

দেয়ালে ডানা মেলা দেবদূত শিশুর ছবি অথবা শিথিলবসনা পরীর ঝলমলে রঙিন প্রতিকৃতি।.....

বোবা নির্বাক যুগ পেরিয়ে পর্দায় নায়ক-নায়িকারা তখন কথা বলছে। গান গাইছে। দুর্গাদাশের যুগ গিয়ে ছায়াছবির জগতের রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। সিংগিং স্টার হিসেবে কুন্দন লাল সায়গল,উমা শশী, কাননবালা, পংকজ মল্লিক যথেষ্ট জনপ্রিয়। ধীরাজ ভট্টাচার্য, মলিনা, ছায়াদেবী চন্দ্রাবতী, অহিন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাসের বাজার গরম রীতিমতো। কাননবালা, জহর গাঙ্গুলী জুটির মানময়ী গার্লস স্কুল, বড়ুয়ার মুক্তি সবচেয়ে সুপারহিট ছবির পুরোভাগে ছিল।

তাঁর মতে পিকচার হাউস ছিল সবচেয়ে পুরনো ছবির ঘর আর মুকুল (আজাদ) ছিল তখনকার সবচেয়ে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ এবং মানসী ছিল সর্বকনিষ্ঠ আধুনিক হল। লিখেছেন তিনি–

(মানসী) তবে জন্ম থেকে সুনাম-দুর্নামের অধিকার। প্রথম বায়োস্কোপ শৈলজানন্দের *জীবন-মরণ*। নামী চিত্রপ্রতিষ্ঠানে নিউ থিয়েটার্সের তো বটেই, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সে যুগের রোমান্টিক জুটি নৃত্যশিল্পী লীলা দেশাই, সুগায়ক সায়গল। এ প্রথম থেকেই ভিড় আর ভিড়।'[৬৬]

প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌসী রহমানেরা বর্ণনায়ও পাওয়া যায় ১৯৫০ দশকে ঢাকায় তাঁর দেখা ছবির বিবরণ। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁর আব্বা আব্বাস উদ্দীন আহমদ খুব সিনেমা দেখতেন। যে ছবির গান ও গল্প ভালো লাগতো সেসব ছবি দেখার জন্য তাঁকে ও তার ভাই মোস্তফা জামান আব্বাসীকে হলে পাঠাতেন। তাঁরা ছবি দেখতেন রূপমহল ও আজাদে। তিনি লিখেছেন–

পল্টনে আসার পর গুলিস্তান সিনেমা হলতো আমাদের চোখের সামনেই হল। রূপমহলেই বেশি ছবি দেখা হয়েছে। এখানে বাংলা ছবিই বেশি দেখনো হতো। আর মেয়েদের জন্য ছিল আলাদা বসার ব্যবস্থা। এখানে মায়ের সাথে ছবি দেখতে যেতাম। টিকেটের দাম ছিল চার আনা কী আট আনা। আসলে তখনতো বিনোদন বলতে শুধু সিনেমা। তাই সিনেমাটাই বেশি দেখা হতো।[৬৭]

১৯৫০ দশকে ঢাকা হতে চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র-পত্রিকা যেমন (সিনেমা ১৯৫১, রূপছায়া-১৯৫১, চিত্রালী-১৯৫৩, চিত্রাকাশ-১৯৫৯) প্রকাশিত হলে তাতে চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও লেখা তেকে ঢাকার সচেতন নারী দর্শকদের কথা জানা যায়।

পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের সিরিয়াস দর্শক হিসেবে ঢাকার অনেক নারী চলচ্চিত্র নির্মাণ, সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন, সমালোচনা ও গবেষনায় জড়িত হন।

ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা হলের অবস্থান, সুযোগ, সুবিধা, নিরাপত্তা ইত্যাদি কারণেও নারী দর্শকদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। যেমন রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মঘট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কখনো কখনো নারী দর্শকদের সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে ছবির বিষয়বস্তুগত কারণেও কোন কোন ছবি নারী দর্শকদের কাছে গ্রহণ-বর্জন হয়েছে। যেমন- *রূপবান* জনপ্রিয় হয়েছিল ছবির গান ও পতিভক্তির কারণে। অন্যদিকে ছবিতে অশ্লীলতা ও প্রতিহিংসা থাকার কারণে মহিলা দর্শকরা

সেসব ছবি প্রত্যাখান করেছে বিশেষ করে ১৯৯০ দশক থেকে। চলচ্চিত্রের নারী দর্শকদের সংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে জানা যায়, একটি জরীপ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দু'জন শিক্ষকের অধীনে এই জরীপ পরিচালিত হয়। জরীপের ফল সম্পর্কে লেখা হয় :

> বাংলাদেশে চলচ্চিত্র দর্শকগোষ্ঠীর একাংশ এখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রায় পুরোটাই বিলোপ পেয়েছে, তারা হলেন নারী-দর্শক। গবেষণকালে হঠাৎ হঠাৎ যে অল্পসংখ্যক নারী দর্শকের দেখা মিলেছে, তাদের অনেকে কথিত যৌনকর্মী, যারা কোনো কোনো দর্শককে অর্থের বিনিময়ে ছবি দেখার পাশাপাশি সীমিত যৌনসেবা দিয়ে থাকেন। নগণ্য নারী-দর্শকদের মধ্যে আরও নগণ্য ছিলেন গৃহ এবং গার্মেন্টস কর্মী। প্রেক্ষাগৃহের দর্শক জরিপে যে ১৬১ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, তাদের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৪.৩৫%) নারী-দর্শক পাওয়া যায়।
>
> অথচ নারী-দর্শকরা একসময় ছিলেন দর্শকগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ। যখন জনপরিসরে এতটা দৃশ্যমান হননি, তখনও শাড়ি-ঘেরা রিকশায় বসে নারী যেতেন সিনেমায়। কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাস পড়ে মনে হয়, উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও দলবেঁধে সিনেমা দেখতে আসতেন। বলাকার লবিতে দাঁড়িয়ে তারা কলকল করে ইংরেজীতে কথা বলতেন। বেশিরভাগ সিনেমা হলেই নারীর জন্য পর্দা-ঘেরা আলাদা একটি অংশ থাকত। সিনেমা শুরুর সময় সেই পর্দা তুলে দেওয়া হতো। পর্দা আবার ফেলা হতো বিরতিতে এবং সিনেমার শেষে। মেয়েদের জন্য আলাদা এই অংশগুলোতে টিকেটের দামও কম ছিল। নারীরা যে দর্শকের একটি বড়ো অংশ তার প্রমাণ সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলো থেকেই পাওয়া যেত। বিজ্ঞাপনে বলা হতো, 'দলে দলে মা-বোনেরা যে সিনেমা দেখছেন', কিম্বা মা-বোনেরা যে ছবি দেখে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন' ইত্যাদি। সিনেমা দেখতে না নিয়ে যাওয়ায় অভিমানে আত্মহত্যা করেছেন কোনো গৃহবধূ– শেষ এই সংবাদ পাওয়া যায়, *বেদের মেয়ের জোসনার* প্রদর্শনকালে। *কাজের বেটি রহিমা, চাকরানী, রানী কেন ডাকাত বা মেয়েরাও মানুষ*-এর মতো ছায়াছবি তৈরি করেও নারী-দর্শকদের আর প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়ে আনা যায়নি।
>
> নারীরা কেন প্রেক্ষাগৃহে আর যান না এই প্রশ্নটি সামনে নিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পেশার ৭০ জন নারীর ওপরে একটি জরিপ পরিচালিত হয়।
>
> শেষ কবে হলে গিয়ে সিনেমা দেখেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে ৪জন (৫.৭১%) বলেছেন তারা ৭০ এর দশকে শেষ হলে গিয়েছেন, ৭ জন (১০%) বলেছেন তারা ৮০ এর দশকে হলে শেষ সিনেমা দেখেছেন এবং ৮ জন (১১.৪২%) বলেছেন তারা ৯০এর দশকে শেষ হলে গিয়েছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন ১৯৯৯ সালে সর্বশেষ ছবি দেখেছেন। ছবির নাম প্রাণের চেয়ে প্রিয়। বাকিরা উত্তর দান থেকে বিরত ছিলেন অথবা শেষ কবে প্রেক্ষাগৃহে গিয়েছিলেন মনে করতে পারেন নি।
>
> উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যে বিষয়টি জানার চেষ্টা করা হয়েছিল তা হলো কেন তারা এখন ছবি দেখতে সিনেমা হলে যান না। অনেকেই (৫১.৪২%) বলেছেন হলের পরিবেশ খারাপ বলে তারা এখন আর হলে যেতে আগ্রহী নন। পরিবেশ খারাপ বলতে

যা তারা হলের অবকাঠামোগত পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে বোঝাতে চেয়েছেন। যে বিষয়গুলোকে তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল: নিরাপত্তাহীনতা, ছেলেদের অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য/ইঙ্গিত, সিনেমা হলে হেরোইনসেবী এবং সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি, নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভাঙ্গা আসন/সিট, নোংরা বাথরুম ইত্যাদি।

প্রেক্ষাগৃহে না-যাবার কারণ হিসেবে এরপর রয়েছে ভালো ও রুচিশীল সিনেমার স্বল্পতা। নারী-দর্শকদের মধ্যে যারা এখানে সব সমস্যা উপেক্ষা করে হলে সিনেমা দেখতে চান, তারা (২৮.৫৭%) সুরুচিপূর্ণ সিনেমা দেখানো হয় না বলে এখন আর হলে যান না। ভালো এবং মৌলিক কাহিনীর অভাবও সিনেমা হলের প্রতি নারী-দর্শকদের আগ্রহ কমে যাওয়ার আরেকটি কারণ। কিছু নারী-দর্শক অভিযোগ করেছেন যেমন ছবি দেখতে চান (পারিবারিক ও সামাজিক কাহিনীনির্ভর ছবি) সেরকম ছবি হলে আসে না বলে দেখা হয় না। কাহিনীর মৌলিকত্বতো নেইই তার ওপর অশ্লীল এবং কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য বা কাটপিস সংযোজন করার ফলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেসব ছবি দেখা সম্ভব নয় বলে কোনো কোনা নারী-দর্শক হলে যান না। তারা আরও বলেন, যেসব ছবির কাহিনী একটু ভালো সেগুলোর প্রযুক্তিক মান (প্রিন্ট, শব্দগ্রহণ) এত খারাপ যে ছবি দেখে আনন্দ পাওয়া যায় না।[৬৮]

চলচ্চিত্র চর্চায় নারী

সাংবাদিকতা ও সমালোচনা

ঢাকার চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও অবস্থান সংখ্যায় কম হলেও গুণে-মানে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় ও সাহসে পুষ্ট।

ঢাকা থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'সিনেমা'র সম্পাদনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষের পাশাপাশি ছিলেন নারীরাও। এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বেগম নাসিম বানু, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন জেবা-উন নেসা খানম।[৬৯]

রাবেয়া খাতুন

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই পত্রিকার সম্পাদক হন রাবেয়া খাতুন। ঢাকা তথা বাংলাদেশের চিত্র সাংবাদিকতার ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখ্যযোগ্য রেকর্ড।

ঢাকার চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার বিকাশে বেগম সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগম সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বেগম' (১৯৫০ এর দশক) পত্রিকাও বিশেষ অবদান রাখে। এই পত্রিকা যখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো তখন থেকেই চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসেবে জড়িত হন হুসনা বানু খানম। হুসনা বানু খানম প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা সাংবাদিক। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় যখন চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি গঠিত হয় তখন এর উদ্যোক্তা-সদস্য ছিলেন হুসনা বানু খানম। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে চিত্র মাসিক 'পরিচয়' প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করেন রোকেয়া সুলতানা। ১৯৬৬ সালে মাসিক 'রূপম' বের হয়। স্বামীর সঙ্গে এটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেন বেবী আনোয়ার।[৭০]

ঢাকা থেকে প্রকাশিত আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার সঙ্গে মহিলারা জড়িত হন। এদের মধ্যে 'রূপালি'র (১৯৬৮) সম্পাদক সৈয়দা আমেনা শফিক। মাসিক 'সমীপেষু' (১৯৭০) এর সম্পাদক ফওজিয়া সাত্তার এবং পাক্ষিক 'চিত্রিতা' (১৯৭০)র সম্পাদক লায়লা সামাদ এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। শেষোক্ত দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রসঙ্গ-বিষয়বস্তু-আলোচনা ছিল খুবই উঁচুমানের।

মাসিক সিনেমার প্রচ্ছদ (১৯৫২)

অভিনেত্রী মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস 'রং বেরং' (১৯৭৬) বের করেন স্বামীর সঙ্গে। রীতা আরেফিনের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'তারকালোক (১৯৮২) প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রে মাহমুদ চৌধুরী স্বকীয় ধারা সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচনা করেন। তাঁর তীব্র তীক্ষ্ম সমালোচনায় অনেক প্রবীণ এবং খ্যাতিমান পরিচালকদের ছবিও ধরাশায়ী হতো। তিনি ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন কোর্স সমাপ্ত করেন। চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে পুনা ফিল্ম ও টিভি ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষিত ফওজিয়া খানও সুনাম অর্জন করেন।

ঢাকাভিত্তিক চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংগঠন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতিতে ২৪ জন নারী সদস্য রয়েছেন।

চলচ্চিত্র সংসদ ও গবেষণা

চলচ্চিত্র সংসদ চর্চা উন্নত মনীষা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচায়ক। নিয়মিতভাবে বিশ্বের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র দেখা, আলোচনা, সমালোচনার আয়োজন করা, সিরিয়াস প্রকাশনা বের করা, চলচ্চিত্র সমীক্ষা কোর্সের আয়োজন করা সংসদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হলে কয়েকজন সাহসী ও সংস্কৃতি মনস্ক চলচ্চিত্র অনুরাগী মহিলা চলচ্চিত্র সংসদ চর্চার সঙ্গে জড়িত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফরিদা হাসান, লায়লা সামাদ, জাহানারা রহমান, নওশেরওয়ান রশীদ। পরে সংসদে যোগ দেন ইভা আলম, রেজিনা আহমেদ, লাইলুন্নাহার, সুবর্ণা মুস্তাফা, সারা যাকের প্রমুখ।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ঢাকার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র সংসদ 'ঢাকা সিনে ক্লাব'। তখন এর অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন লায়লা সামাদ। চলচ্চিত্র সংসদ চর্চা ও বিকল্প ধারার চলচ্চিত আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন মুনীরা মোরশেদ মুন্নী, শামীম আখতার প্রমুখ।

সীমিত পরিমাণে হলেও ঢাকার চলচ্চিত্র গবেষণার ক্ষেত্রেও ক'জন নারীকে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ড. গীতি আরা নাসরীন, শেখ মাহমুদা সুলতানা, শামীম আখতার, ফওজিয়া খান, অদ্বিতি ফাল্গুনী গায়েন, হোমায়রা বিলকিস, কাবেরী গায়েন, তপতী বর্মণ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রশাসন

ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র তথা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। যেমন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগ প্রাপ্তির সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

কামরুন্নাহার

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। সেন্সর বোর্ডে প্রতিবছর অন্যান্য সদস্যের সাথে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মহিলারাও সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়ে বিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে সেন্সর বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দৌলতুন্নেসা খাতুন (১৯৫০ দশক), আখতার ইমাম (১৯৬০ দশক), মাহনুর রহমান (১৯৭০) এবং স্বাধীনতার পর ড. নীলিমা ইব্রাহীম, পান্না কায়সার, বেগম শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, সাদেকা শফিউল্লাহ, সুলতানা ইসলাম, মমতাজ হোসেন, জুলেখা হক, রাজিয়া খান আমিন, কবরী সারোয়ার, ববিতা, সারা যাকের প্রমুখ।

অন্যদিকে সেন্সর বোর্ডের অন্যতম উচ্চতর পদ ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে মিসেস কামরুন্নাহার ২০০৬-২০০৮ সালে অত্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা, মাত্রাতিরিক্ত সংঘাত, রক্তপাত ও প্রতিহিংসাপূর্ণ দৃশ্য নির্মূলে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পরে তিনি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (২০০৮-২০০৯) এবং একই সঙ্গে কিছুদিন ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান (২০০৯) এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক (২০০৯-১৩) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক হিসেবে হাফিজা আখতার ও পরিচালক হিসেবে হোসনে আরা আখতার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (চলচ্চিত্র) হিসেবে শামীম আরা খানম এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কানিজ ফাতেমা বিভিন্ন সময়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপসংহার

ঢাকায় বিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু করে মাত্র একশো বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র নারীকে নানাভাবে ফোকাস করেছে। চলচ্চিত্রে নারীদের বিকৃত উপস্থাপনা নিয়ে নানা কথা উঠলেও এ মাধ্যমে তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে পেশাগতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের দিয়েছে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগও। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্প (ব্যবসা ও শিল্প দুই-ই অর্থে) গড়ে না উঠলে 'ঢাকাই সিনেমা' কথাটির জন্ম হতো না। ঢাকায় চিত্রশিল্প গড়ে ওঠেছে বলেই সুমিতা, সুলতানা জামান, রওশন আরা, শবনম, কবরী, সুচন্দা, রোজী, আনোয়ারা, শাবানা, ববিতা, মৌসুমী, শাবনুরদের মতো অভিনেত্রী-নায়িকা-তারকার জন্ম হয়েছে এবং তাঁরা খ্যতি দ্যুতি ছড়িয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীরা পেয়েছেন প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। 'ঢাকার চলচ্চিত্র ও নারী' জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্কৃতিকে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা ও গৌরব। বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও ও লিঙ্গ সমতাভিত্তিক

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা ঢাকার চলচ্চিত্রাঙ্গনে নারীকে ভবিষ্যতে দেবে আরো ব্যাপক নান্দনিক উপস্থাপনা ও নানাভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ এটাই কাম্য।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. গ্রীক শব্দ 'কিনেমা' থেকে 'সিনেমা' শব্দের উৎপত্তি। ফ্রান্সের লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৯৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রথম যে যন্ত্রের সাহায্যে চলচ্চিত্র দেখায় তার নাম 'সিনেমাটোগ্রাফ'। এর আগে চলন্ত ছবি দেখানোর যন্ত্রের আরো অনেক নাম ছিল। যাই হোক, লুমিয়ের ভাইদের যন্ত্রের নামেই শেষ পর্যন্ত 'সিনেমা' শব্দটির প্রচলন হয়। পরবর্তীতে 'সিনেমা' বায়োস্কোপ, মুভি, ফিল্ম, টকি নামেও পরিচিতি পায়। বাংলা ভাষায় এটি বই, ছবি এবং চলচ্চিত্র নামে পরিচিতি পায়।

২. সাপ্তাহিক '*ঢাকা প্রকাশ*', ঢাকা ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৮, উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকায় বায়োস্কোপের ইতিকথা*, দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ১৪ আশ্বিন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ থেকে উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ১৯৮৭, ঢাকা; পৃঃ ১-৩।

৩. পুরানো ঢাকার সদর ঘাট এলাকার পটুয়াটুলিতে ছিল নাট্যালয় ক্রাউন থিয়েটার। ১৮৯০ দশকে এই থিয়েটারের ছিল রমরমা অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার ঢাকায় এসে ১৮৯৮ সালের ৩১ মে-১জুন এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই থিয়েটার বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আলোচ্য স্থানটি ১৬/১, আহসানুল্লাহ রোড, ঢাকা নামে চিহ্নিত করা হয়।

৪. *দি টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই ৮ জুলাই, ১৮৯৬, উদ্ধৃত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের *চলচ্চিত্রের আবির্ভাব*, ১৯৮৪, কলকাতা, পৃঃ১৩৮।

৫. *দি ইংলিশম্যান*, কলকাতা, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি, ১৮৯৭।

৬. ফওজিয়া খান, চলচ্চিত্রে নারীবাদ, মাহমুদুল হোসেন (সম্পাদিত) *দৃশ্যরূপ*, বার্ষিক সংকলন, ১৪১১-১৪১২ (২০০৬ খৃঃ) ঢাকা, পৃঃ ৭৫-৭৬ ও শামীম আখতার, *চলচ্চিত্র, পুরুষতন্ত্র, নারী প্রেক্ষিত*, নূহ-উল-আলম লেনিন (স), *প্রসঙ্গ, নারী : নানা প্রেক্ষিত*, ২০০৮, ঢাকা পৃঃ ১৭৯ এবং ইন্টারনেট।

৭. বিস্তারিত দেখুন মানবেন্দ্র নাথ সাহা, *ভারতীয় সিনেমা: মুসলিম অভিনেত্রী, অন্য দৃষ্টি*, ২০০৯, কলকাতা (২) ফওজিয়া খান; *চলচ্চিত্রে নারীবাদ, প্রাগুক্ত*, (৩) শামীম আখতার, *প্রাগুক্ত* ও (৪) বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক, *উইমেন অন স্ক্রীন : রিপ্রেজেন্টিং উইমেন, বাই উইমেন ইন বাংলাদেশ সিনেমা*, ২০০৯, ঢাকা।

৮. শামীম আখতার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।

৯. সত্যেন সেন, *শহরের ইতিকথা*, ১৯৭৪, ঢাকা পৃঃ ১০৪-১০৬।

১০. উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, পুরানো *ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, ২০০১, ঢাকা, পৃঃ ৭১-৭৭।

১১. উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, ১৯৭৯, পৃঃ ৬৩-৭৭।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮।

১৩. ওবায়দুল হক সরকার, *পঞ্চাশ দশকের পত্র-পত্রিকার ঢাকার নাটক*, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃঃ ১৭-৩২, ৪৪, ৪৭, ৫৫-৫৭, ৬২, ৬২-৬৭, ৭৪-৭৫; জাহানারা ইমাম, *নাটকে মহিলা শিল্পী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রকাশিত, *ঢাকা মহানগরী নাট্যচর্চা*, ১৯৯২, ঢাকা পৃঃ ৬১-৭১।

১৪. প্রতিভা বসু, *জীবনের জলছবি*, ঢাকা, ১৪০৩ বঙ্গাবন্দ, কলকাতা, পৃঃ ২৭-২৮।

১৫. সাপ্তাহিক '*ঢাকা প্রকাশ*', ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৮। উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, পৃঃ ১-৩।

১৬. মোহাম্মদ আলমগীর, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নওয়াবঃ ঐতিহাসিক রূপরেখা*, ২০০৩. ঢাকা, পৃঃ ৯৪।

১৭. সাপ্তাহিক *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ মে, ১৯০, উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২-৩।

১৮. দেবী ঘোষ (সঃ) *অভিনেত্রী কথা*, ২০০৯, কলকাতা, পৃঃ ৯।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯-১০।

২০. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, *সোনার দাগ*, ১৯৮৮, কলকাতা, পৃঃ ২৪-২৫।

২১. দেবী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০।

২২. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃঃ ১০-১১।

২৩. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, ১০-১১।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১-১৬।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০-৫২।

২৯. পেয়ারী বেগম, *ভাবতাম মধুবালা হব*, মোহাম্মদ আসাদ (স), *ঢাকা ত্রৈমাসিক*, জুলাই, ২০০৮, ঢাকা পৃঃ ১৫৫-১৫৭।

৩০. সুমিতা দেবী, *আমার কথা*, রীতা আরেফিন (সম্পাদিত) পাক্ষিক *তারকালোক*, ঢাকা, বিশ সংখ্যা, ২০০১, পৃঃ ৭৭-৮০; ও অব্যয় রহমান, *সুমিতা দেবী*, ২০০৯, ঢাকা পৃঃ ১৬-৩৪।

৩১. অব্যয় রহমান, *সুমিতা দেবী*, ২০০৯, ঢাকা পৃঃ ১৫।

৩২. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪।

৩৩. ফওজিয়া খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭।

৩৪. তানভীর মোকাম্মেল, *নদী ও নারীর কথা, সিনেমার শিল্প রূপ*, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃঃ ৭৯।

৩৫. অসিত কুমার ভট্টাচার্য, *সারেং বউ: চলচ্চিত্রে সাহিত্য*, খালেদ হায়দার(স), *ত্রৈমাসিক চলচ্চিত্র*, ঢাকা ৪ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, মার্চ-জুন, ১৯৭৯ ।

৩৬. শেখ মাহমুদা সুলতানা, *ঢাকার চলচ্চিত্রে নারী: মানব, দেবতা ও পতির রাজ্যে-নষ্টা এক্সট্রা ও সতী*, গীতিআরা নাসরীন প্রমুখ সম্পাদিত *গণমাধ্যম ও জনসমাজ*, ২০০২, ঢাকা, পৃ: ১৯৮-২০৪ ।

৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ।

৩৮. প্রাগুক্ত ।

৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ।

৪০. প্রাগুক্ত ।

৪১. শেখ মাহমুদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৩-২১৪ ।

৪২. কবরী সারোয়ার উপস্থাপিত প্রবন্ধ, *চলচ্চিত্রে নারী: প্রাসঙ্গিক ভাবনা*; ১৫.০৬.২০০৩ তারিখে পঠিত ।

৪৩. দেবী ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫ ।

৪৪. রেবেকার যতকথা, পাক্ষিক *তারকালোক* ১০ম সংখ্যা, শাপলা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৮৪, পৃ: ৬৪-৬৬ ।

৪৫. তালিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগৃতীত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৯ ।

৪৬. বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রাগুক্ত, *এ্যাবস্ট্রাক* ও পৃ: ৮০-৮৯ ।

৪৭. এফডিসিতে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট নথি থেকে প্রাপ্ত, জুলাই-আগষ্ট, ২০০৯ ।

৪৮. প্রাগুক্ত ।

৪৯. প্রাগুক্ত ।

৫০. প্রাগুক্ত ।

৫১. প্রাগুক্ত ।

৫২. অব্যয় রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২-৬৬ ।

৫৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিবেশক সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, ১৬.০৯.২০০৮ ।

৫৪. বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫-৮৯ ।

৫৫. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪ ।

৫৬. চিত্র পরিচালক, সি.বি জামানের সাক্ষাৎকার, ২১.১০.২০০৯ ।

৫৭. খাজা শামসুল হকের অপ্রকাশিত ডায়েরি, উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র, ২০০৯, ঢাকা, পৃ: ২৩-২৪ ।

৫৮. সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ, ১১ মে, ১৯০২ । উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকায় বায়োস্কোপের ইতিকথা*, *দৈনিক বাংলা*, ১৪ আশ্বিন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ঢাকা ও অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ: ৩ ।

৫৯. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ১৮৯৭, ঢাকা পৃঃ ৪।

৬০. খাজা নওদুদের অপ্রকাশিত ডায়েরি, উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র*, ১৯৮৭, ঢাকা পৃঃ ৬৬।

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. ভবতোষ দত্ত, *আট দশক*, ১৯৯১, কলকাতা, পৃঃ ৪৮-৪৯।

৬৪. যোবায়দা মির্যা, *তিরিশ দশকে ঢাকার ছবি*; মুহম্মদ খসরু সম্পাদিত *চলচ্চিত্র পত্র*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের ফিল্ম বুলেটিন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা, পৃঃ ১৯-২৬।

৬৫. সানজিদা খাতুন, *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪, উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র*, ২০০৯, ঢাকা পৃঃ ৯১-৯৩।

৬৬. রাবেয়া খাতুন, *স্বপ্নের শহর ঢাকা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৭। উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬।

৬৭. ফেরদৌসী রহমান, *শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ, আমার আব্বার কথা*, সাহিত্য সাময়িকী, *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৯।

৬৮. গীতি আরা নাসরীন ও ফাহমিদুল হক, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি*, ২০০৮, ঢাকা, পৃঃ ১৪৭-১৪৯।

৬৯. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস*, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃঃ ১৩৯-১৪০।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২-১৪৩।

পঞ্চম অধ্যায়

বিজ্ঞাপন

বিশেষভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে যা জ্ঞাপন করা হয় তাই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন হচ্ছে মূলত বিপণনকলা। মালিক/উৎপাদক/পরিবেশক বা বিক্রেতা যখন তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ার্থে ক্রেতাদের মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে প্রচারণা চালায় তখন তাকে বিজ্ঞাপন বলে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের পরিচয়, নাম, গুণ ও মানের বিবরণ ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরা হয়। ক্রেতা ইচ্ছে করলে সেই পণ্য বা মাল কিনতে পারেন বা নাও কিনতে পারেন। তবে বিজ্ঞাপন দেখে বা শুনে বা জেনেই কেউ পণ্য ক্রয়ের জন্যে দোকানে দৌড়ায় না। এজন্যে প্রয়োজন অর্থের। ক্রেতা বা ভোক্তার থাকতে হবে ক্রয় ক্ষমতা। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে উদ্যোক্তা, পুঁজি, শ্রম, পণ্য, বিনিয়োগ, বাজার, ভোক্তা, সরবরাহ, চাহিদা, উপস্থাপনা ইত্যাদি জড়িত।

বিজ্ঞাপন উপস্থাপন বা প্রচার-প্রকাশ জ্ঞাপনের জন্যে বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যেমন– সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন, উন্মুক্ত মঞ্চ বা দেয়াল, চিঠিপত্র এবং সাম্প্রতিককালের ইন্টারনেট, ই-মেইল প্রভৃতি।

বাজার অর্থনীতি, পণ্যের অধিক কাটতি, বিক্রয়, মুনাফা ইত্যাদির জন্যে বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহার করা হয় নানাভাবে। কেননা, বাজার অর্থনীতি ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের কাছে নারীও হলো পণ্য। বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপন হতে পারে তার চিত্রসহ শারীরিক অঙ্গভঙ্গী, অভিনয়, বাচনিক, নৃত্যময়, সাংগিতিক, কার্য বা পেশাভিত্তিক। এটা নির্ভর করে মাধ্যমের ওপর। যেমন প্রেক্ষাগৃহে বা টিভিতে নারীক চিত্র ও ধ্বনির সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়, আবার বেতারে ধ্বনি, শব্দ বা সংলাপের সঙ্গে, হ্যান্ডবিলে স্থিরচিত্র ও অক্ষর-শব্দের সঙ্গে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্পের অতীতের ইতিহাস ও অবকাঠামোগত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। সাধারণত এর ইতিহাস ধরা হয় ১৯৭১ সালের পর হতে। অথচ সেই উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহারের ঐতিহ্য লক্ষ্যণীয়। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই সত্যজিৎ রায়ের ফুফা প্রখ্যাত আলোকচিত্রী ও বাঙালি রেকর্ড কোম্পানির মালিক এইচ. বোস (১৮৬৬-১৯১৬) কর্তৃক সুগন্ধি দ্রব্য 'দেলখোশ' ও 'কুন্তলীন' কেশ তেলের বিজ্ঞাপনের কথা। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'কুন্তলীন'-এর বিজ্ঞাপনে কবিতা ও গদ্যে সুলিখিত বক্তব্যের সঙ্গে ছিল 'মাঝখানে দুই সখি পরিবৃতা নৌকা লীন স্বপ্নের রাজকন্যা'র ছবিও।

ওই সময় তেল, স্নো, পাউডার, অলঙ্কার, শাড়ি প্রভৃতি নারী সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের সঙ্গে 'নারী'ই ব্যবহার করা হতো। এমনকি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ১৯২২ সালের ১৭ অক্টোবরে প্রকাশিত 'ধুমকেতু' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'হিমানী' স্নো'র সঙ্গে সুন্দর নারীমুখ ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

১৯০১ সালের দিকে প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) 'জবাকুসুম' কেশ তেলের বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তার বিজ্ঞাপন চিত্রে নারীর ব্যবহার ছিল কিনা তা প্রমাণের অভাবে বলা যাচ্ছে না। ১৯২০-৩০ দশকে ঢাকা হতে প্রকাশিত অনেক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে নারীর ছবি ব্যবহার করা হতো। ১৯৪৭ এর পর 'বেগম' পত্রিকা ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ওই সময় হতে বিজ্ঞাপনে 'নারী'র ব্যবহার আরো বেড়ে যায়। ১৯৬০ সালের দিকে ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' ও 'চিত্রালী' পত্রিকা অফসেট পদ্ধতিতে রঙিন আকারে বের হতে শুরু করলে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে 'নারী'র ব্যবহারও রঙিন এবং আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ওই সময়ে বিভিন্ন মডেলের রঙিন শাড়ি পরা অবস্থায় অথবা 'লাক্স সাবানে' চিত্রতারকাদের ছবি (শবনম ও সুলতানা জামান), এ্যাসপ্রো ট্যাবলেটে সুমিতার মুখের ব্যবহার স্মরণযোগ্য। এছাড়া তিব্বত প্রসাধন সামগ্রী, লালবাগ কেমিক্যালের বিভিন্ন দ্রব্য প্রভৃতির সঙ্গেও নারী ব্যবহার করা হতো। এসব বিজ্ঞাপনের ডিজাইন, শ্লোগান, নারীর উপস্থাপন ছিল আকর্ষণীয় ও শ্লীল। কোনোরকম অশ্লীলতা ও অশোভনতা বা নারীর জন্যে মর্যাদা হানিকর কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো না।

১৯৬৪ সালের দিকে প্রিমিয়ার ইন্সুরেন্স কোম্পানির বিজ্ঞাপনে নারীর স্কেচের সঙ্গে ছিল সুন্দর শ্লোগান :

> *'স্বামীর স্বাস্থ্য, সন্তানের ভবিষ্যত, পারিবারিক নিরাপত্তা– জীবনের রঙ্গমঞ্চে আপনাকে ভানুমতীর ভূমিকায় এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'*

একই বছর পত্রপত্রিকায় 'নাজ জুয়েলার্স' এর বিজ্ঞাপনটিও ছিল শোভন এবং আকর্ষণীয়। এতে ছিল বিভিন্ন অঙ্গে অলংকার শোভিতা অদ্ভুত ভঙ্গিমায় অংকিত এক নারীর স্কেচ।

১৯৬৭ সালে ঢাকা বেতার কেন্দ্র হতে চালু হয় বিজ্ঞাপন ভিত্তিক 'কমার্সিয়াল সার্ভিস'। এতে নারীকণ্ঠের নানারকম শ্রুতিমধুর ব্যবহার হতো পণ্যের প্রচারণায়। এতে নারী ও পরিবার কেন্দ্রিক এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণজনক পণ্য বা সামগ্রীর সঙ্গে নারীর কণ্ঠ, গান বা সংলাপ ব্যবহার করা হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে ১৯৪৭ উত্তর পরিবেশে বিজ্ঞাপন শিল্পে কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যেসব বিজ্ঞাপন যেসব বিজ্ঞাপন তৈরি বা রিলিজ করা হতো তাতে নারীর উপস্থাপনা পণ্যের মান ও গুণের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সাবলীল ছিল। ষাটের দশকেও এই ধরা অব্যাহত থাকে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন মাণিকদের নতুন পণ্য চালু হয়। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে বিজ্ঞাপনী সংস্থাও। উদ্যোক্তাও ইচ্ছে অনুযায়ী বিজ্ঞাপনে তখন নারী মডেলের চাহিদা বেগে যায়। টেলিভিশনও প্রচারচিত্রের বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে নারী মডেলের সংখ্যাও তখন বাড়তে থাকে। অন্যদিকে 'কারুকৃত' নামে একটি সংস্থা তাদের ডিজাইনে নারীর স্কেচ ব্যবহার করে কিছুটা খোলাখুলিভাবে। এ নিয়ে ওই সময় অর্থাৎ ১৯৭২-৭৬ সালে বেশ সমালোচনাও হয় বিভিন্ন মহলে।

আশি ও নব্বই থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, প্রতিযোগিতা, বিদেশী গণমাধ্যমের প্রভাব বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের ওপর পড়ে। এর ফলে নারীর উপস্থাপনা আরো বেড়ে যায়। নারী-সংশ্লিষ্ট পণ্য ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা বা রূপায়ণে নারী যোগ হয়। বিজ্ঞাপন প্রচারের আকর্ষণীয় ও উন্নত মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন। তবে এর মধ্যে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন প্রচারের সংখ্যা যেমন বেশি তেমন আকর্ষণীয়ও। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন নিয়ে গবেষণা করেছেন মুশতাক আহমদ। এতে দেখা যায় নারীকে উপস্থাপন করা হয় গৃহকর্ত্রী, মমতাময়ী মা, পেশাহীন, পুরুষনির্ভর সত্তা, সৌন্দর্য সামগ্রী, পুরুষের সান্নিধ্যপ্রয়াসী, নির্বোধ, যৌনতার প্রতীক, প্রসাধনপ্রিয়, প্রেমিকা, বান্ধবী, স্ত্রী, অনুপ্রেরণাদাত্রী, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল, অনুগত, লাজুক, পুরুষের পরামর্শগ্রহণকারী হিসেবে।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ইন্টারন্যাশনাল লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপনে এক সুন্দরী নারী ধীরগতিতে হেঁটে আসছে– শুধু সুদর্শন মুখমণ্ডল দেখানোর জন্য। হক ব্যাটারির বিজ্ঞাপনে অপ্রয়োজনে নারীর সুন্দর মুখ ব্যাটারির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। টেস্টি স্যালাইনের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, দু'জন নারী নাচছে। স্যালাইন হলো খাওয়ার ওষুধ, যা মানুষের শরীরের পানিশূন্যতা রোধ করে; এখানে নারীর নাচ-গানের প্রয়োজন নেই।

বেশিরভাগ বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ প্রদর্শন করা হয় নানা ভঙ্গিমায়। প্রসাধনীর বিজ্ঞাপনে নারীকে বেশি পরিমাণে যৌনাবেদনকারী হিসেবে দেখানো হয়। এ প্রসঙ্গে তিব্বত লাক্সারি ট্যালকম পাউডার, মেরিল ট্যালকম পাউডার, অ্যারোমেটিক বিউটি সোপ, ডেটল সাবান, মেরিল ফ্রেশজেল, টুথপেস্ট প্রভৃতি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ্য।

বিজ্ঞাপনে নারীকে কর্মহীন, রান্নাঘর ও বাথরুম, ড্রয়িং রুমের বস্তু, প্রসাধন ও সৌন্দর্য সামগ্রী, যৌনভোগ্য বস্তু হিসেবেই বেশি রূপায়ণ করা হয়। তিব্বত লাক্সারি পাউডার, হুইল সাবান, আলকাতরা, ঢেউটিন, সিমেন্ট, আরসি কোলা, কোমল পানীয় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত নারীর যে রূপায়ণ তা কেবল ভোগের, উৎপাদনের নয়। অন্যদিকে আরো কিছু বিজ্ঞাপন রয়েছে যাতে পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে অপমানজনক অবস্থায় দেখানো হয়, যেমন– প্রসাধনের গুণেই একজন নারী বিমানবালা হওয়ার সুযোগ পায়। বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ মডেলিং পেশার জন্ম দিয়েছে। এই পেশা নিয়েও রয়েছে ভিন্নতর প্রসঙ্গ। অনেক নারী-মডেল হচ্ছে নির্যাতনের শিকারও।

নারী-সত্তার অপমানজনক উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞপনেও। এই মাধ্যমে নারীর সচল বা স্থিরচিত্র থাকে না, তবে থাকে পণ্যের মতো রূপ-গুণ-বয়স-উচ্চতা-সৌন্দর্য-শিক্ষা-সম্পদের বিবরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাবেরী গায়েন এ ধরনের বিজ্ঞাপন নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন, সেই উনিশ শতকের প্রারম্ভে নারীবিষয়ক বিজ্ঞাপনে শালীনতার স্তর যে নিচু পর্যায়ে ছিলো এই ইন্টারনেটের যুগে তা যেন আরো বহু স্তরে বেড়ে গেছে। এতটি নমুনা :

> *'ঢাকার ভদ্র গ্রাজুয়েট ঔষধ ব্যবসায়ী, অপরজন ধার্মিক ডাক্তার, স্ত্রীর সঙ্গত কারণে অনুমতিতে ঝামেলামুক্ত দ্বিতীয় বিবাহ ও আলাদা বাসায় রুচিশীল, ধার্মিক পাত্রী চাই। বন্ধ্যা/বিবাহ বিচ্ছেদে আপত্তি নেই, নিঃসন্দেহে লিখুন। (দৈনিক ইনকিলাব, ১৯/১১/৯৯)।*

প্রভাব

বিজ্ঞাপনে নারীর সুশোভন উপস্থাপনা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুস্থ পরিবেশ ও শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাকরত উন্নয়নে সহায়ক হয়। অন্যদিকে অশ্লীল ও অশোভন উপস্থাপনা সমাজে শুধু নারীদের বিরুদ্ধে ভায়োলেন্সের জন্ম দেয় না, আরো নানা অপরাধ ও ঘটনার জন্ম দেয়। যেমন–

১। নারীর অশ্লীল উপস্থাপনা ও রূপায়ণ পুরুষ মনে কু-বাসনা ও অনৈতিক উত্তেজনার উদ্রেক করে। ফলে তারা প্রলোভিত হয় এবং নানা অপরাধ করে।

২। প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমাজে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শোষণ, অপহরণ, উত্ত্যক্তকরণসহ নারীবিরোধী অপরাধের জন্ম দেয়।

৩। নারী সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভঙ্গী গড়ে ওঠে এবং নারী কেবল সৌন্দর্য ও ভোগ্যসামগ্রীর প্রতীকে পরিণত হয়।

৪। দর্শক/ভোক্তা মনে অসুস্থ মানসিকতা ও বিকারগ্রস্ততা, সামাজিক ক্ষেত্রে অনৈতিকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রুচিহীনতার জন্ম দেয়।

৫। নারীর অসহায়ত্ব, অর্থনৈতিকভাবে পুরুষনির্ভরতা, পেশাগত ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অসামর্থতা এবং অনুৎপাদক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৬। নারীর অপভাবমূর্তি সৃষ্টির কারণে সমাজের অন্যান্য সুবিধাভোগী শ্রেণী কর্তৃক প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়।

উপসংহার

যুগ পাল্টাচ্ছে; কারিগরি উৎকর্ষ, বৈজ্ঞারিক আবিষ্কার, বিশ্বায়ন, প্রতিযোগিতা, শিক্ষা, গবেষণা, পেশার বহুমুখীকরণ, মুক্তচিন্তা, স্বনির্ভরতা অর্জন, মানসিকতার বিকাশ, অধিকার সচেতনতা, সামাজিকীকরণ, উন্নয়ন, প্রতিভার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি প্রেক্ষিতে বিজ্ঞাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে নারীর সঠিক, শ্লীল, উন্নয়নমুখী প্রতিফলন হওয়া উচিত। বিজ্ঞাপন শুধু ব্যবসায়-প্রচার-প্রসার লাভের পণ্য ও মাধ্যম নয়,

শিল্প মাধ্যম এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যমও। সুন্দর জীবন, পরিবার, দেশ, সমাজ গঠনে নারীকে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে বিনোদনের উপকরণ হিসেবে, পুরুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থের উপাদান হিসেবে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করলে চলবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে বিজ্ঞাপন জীবন ও সমাজকে তথ্য-বিনোদন-শিক্ষা-ভোগের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। আর সমাজ হচ্ছে মানুষের সমাস এবং নারী-পুরুষের মিলিত সমাজ; তা যতোই গ্লোবাল-ফ্রি মার্কেট, ন্যাশনাল-মাল্টি ন্যাশনাল হোক না কেন। সমাজের অর্ধেক নারী আর অর্ধেক পুরুষ। কাজেই বিজ্ঞাপনে নারীর বিকৃত ও অশ্লীল উপস্থাপনা সমাজের জন্যই ক্ষতিকর।

সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভিত্তি নির্মাণ করতে হলে নারীর যথার্থ ও বাস্তব ভূমিকা মূল্যায়নপূর্বক তাকে সুশোভন ও কল্যাণকরভাবে চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনসহ সকল গণমাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে, অশোভন উপস্থাপনা সম্বলিত চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি একদিকে জাতিসংঘের উদ্যোগে সারা বিশ্বে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও কর্মসূচি চলছে। অন্যদিকে চলচ্চিত্র, পত্রপত্রিকা, ভিডিও মাধ্যম, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট প্রভৃতি মাধ্যমে আবাধ তথ্য ও বিনোদনের নামে নারীকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনে নারীর অশ্লীল অবাস্তব ও অসৃজনশীল রপায়ণ বা উপস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা, বিবৃতি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রচনা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সমাবেশ, মিছিল, স্মারকলিপি ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত তৈরির পাশাপাশি বাস্তব কাজ হবে নারীর মর্যাদা, সেবা, উন্নয়ন, মৌলিক সত্তা এবং অধিকার সংক্রান্ত চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন নির্মাণ, প্রদর্শন ও প্রচার করা।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. ১৫/৬/১০০৩ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে বিসিডিজেসি আয়োজিত 'বিজ্ঞাপন ও নারী' শীর্ষক কর্মশালায় পঠিত নাজমা আনোয়ার, সারা যাকের, মোজেজা আশরাফ মোনালিসা, আহমেদ ইউসুফ সাবের, আলাউদ্দীন তালুকদার, ঈশিতা, শবনম, শ্রাবন্তী, মনির খান, শিমুল ও গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী পঠিত প্রবন্ধ।

২. বারিদবরণ ঘোষ : কুন্তলীন পুরস্কার ও এইচ. বোস, দেশ বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৫, কলকাতা।

৩. মুশতাক আহমদ : বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাইম-টাইম বিজ্ঞাপনে নারীর রূপায়ণ; গীতি আরা নাসরীর, মফিজুর রহমান ও সিতারা পারভীন সম্পাদিত 'গণমাধ্যম ও জনসমাজ', ২০০২, ঢাকা।

৪. কাবেরী গায়েন : পাত্র-পাত্রী চাই : সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবাহ বিজ্ঞাপনের লৈঙ্গিক, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রাগুক্ত, 'গণমাধ্যম ও জনসমাজ'।